হিমু

হুমায়ূন আহমেদ



উৎসর্গ

আয়েশা মোমেন,

আপা, আপনি ভালবাসার যে কঠিন ঋণে আমাকে জড়িয়ে রেখেছেন, সেই ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। ঋণী হয়ে থাকতে ভাল লাগে না, কিন্তু কী আর করা!

প্রসঙ্গ হিমু

হিমু আমার প্রিয় চরিত্রের একটি। যখন হিমুকে নিয়ে কিছু লিখি — নিজেকে হিমু মনে হয়, একধরনের ঘোর অনুভব করি। এই ব্যাপারটা অন্য কোনো লেখার সময় তেমন করে ঘটে না। হিমুকে নিয়ে আমার প্রথম লেখা ময়ূরাক্ষি। ময়ূরাক্ষি লেখার সময় ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ করি। দ্বিতীয়বারে লিখলাম দরজার ওপাশে। তখনো একই ব্যাপার। কেন এরকম হয়? মানুষ হিসেবে আমি যুক্তিবাদী। হিমুর যুক্তিহীন, রহস্যময় জগৎ একজন যুক্তিবাদীকে কেন আকর্ষণ করবে? আমার জানা নেই। যদি কখনো জানতে পারি — পাঠকদের জানাব।

হুমায়ূন আহমেদ
এলিফেন্ট রোড।

১

'কি নাম বললেন আপনার, হিমু?'

'জ্বি, হিমু।'

'হিম থেকে হিমু?'

'জ্বি–না, হিমালয় থেকে হিমু। আমার ভাল নাম হিমালয়।

'ঠাট্টা করছেন?'

'না, ঠাট্টা করছি না।'

আমি পাঞ্জাবির পকেট থেকে ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট বের করে এগিয়ে দিলাম। হাসিমুখে বললাম, সার্টিফিকেটে লেখা আছে। দেখুন।

এষা হতভম্ব হয়ে বলল, আপনি কি সার্টিফিকেট পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ান?

'জ্বি, সার্টিফিকেটটা পকেটেই রাখি। হিমালয় নাম বললে অনেকেই বিশ্বাস করে না, তখন সার্টিফিকেট দেখাই। ওরা তখন বড় ধরনের ঝাঁকি খায়।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এষা বলল, আপনি কি চলে যাচ্ছেন?

'হুঁ।'

'এখন যাবেন না। একটু বসুন।'

আমার যেহেতু কখনোই কোনো তাড়া থাকে না — আমি বসলাম। রাত নটার মতো বাজে। এমন কিছু রাত হয়নি — কিন্তু এ বাড়িতে মনে হচ্ছে নিশুতি। কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। বুড়ো একজন মানুষের খকখক শুনছিলাম, এখন তাও শোনা যাচ্ছে না। বুড়ো মনে হয় এই ফ্ল্যাটের নয়। পাশের ফ্ল্যাটের।

এষা আমার সামনে বসে আছে। তার চোখে অবিশ্বাস এবং কৌতূহল একসঙ্গে খেলা করছে। সে অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছে, আবার জিজ্ঞেস করতে ভরসা পাচ্ছে না। আমি তাদের কাছে নিতান্তই অপরিচিত একজন। তার দাদীমা রিকশা থেকে পড়ে মাথা ফাটিয়েছেন। আমি ভদ্রমহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে মাথা ব্যান্ডেজ করে বাসায় পৌঁছে বেতের সোফায় বসে আছি। এদের কাছে এই হচ্ছে আমার পরিচয়।

আমি খানিকটা উপকার করেছি। উপকারের প্রতিদান দিতে না পেরে পরিবারটা

একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে। ঘরে বোধহয় চা-পাতা নেই। চা-পাতা থাকলে এতক্ষণে চা চলে আসত। প্রায় আধ ঘণ্টা হয়েছে। এর মধ্যে চা চলে আসার কথা।

আমি বললাম, আপনাদের বাসায় চা-পাতা নেই, তাই না?

এষা আবারো হকচকিয়ে গেল। বিস্ময় গোপন করতে পারল না। গলায় অনেকখানি বিস্ময় নিয়ে বলল, না, নেই। আমাদের কাজের মেয়েটা দেশে গেছে। ওই বাজার-টাজার করে। চা-পাতা না থাকায় আজ বিকেলে আমি চা খেতে পারিনি।

'আমি কি চা-পাতা এনে দেব?'

'না না, আপনাকে আনতে হবে না। আপনি বসুন। আপনি কী করেন?'

'আমি একজন পরিব্রাজক।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।'

এষা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আপনি কি ইচ্ছা করে আমার প্রশ্নের উদ্ভট উদ্ভট জবাব দিচ্ছেন?

আমি হাসিমুখে বললাম, যা সত্যি তাই বলছি। সত্যিকার বিপদ হল — সত্যি কথার গ্রহণযোগ্যতা কম। যদি বলতাম, আমি একজন বেকার, পথে-পথে ঘুরি, তা হলে আপনি আমার কথা সহজে বিশ্বাস করতেন।'

'আপনি বেকার নন?'

'জ্বি-না। ঘুরে বেড়ানোই আমার কাজ। তবে চাকরিবাকরি কিছু করি না। আজ বরং উঠি?'

'দাদীমা আপনাকে বসতে বলেছে।'

'উনি কী করছেন?'

'শুয়ে আছেন। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনি যদি এখন চলে যান তা হলে দাদীমা খুব রাগ করবেন।'

'তা হলে বরং অপেক্ষাই করি।'

আমি বেতের সোফায় বসে অপেক্ষা করছি। আমার সামনে বিব্রত ভঙ্গিতে এষা বসে আছে। বসে থাকতে তার ভাল লাগছে না তা বোঝা যাচ্ছে। বারবার তাকাচ্ছে ভেতরের দরজার দিকে। এর মধ্যে দু'বার হাতঘড়ির দিকে তাকাল। উপকারী অতিথিকে একা ফেলে রেখে চলে যেতেও পারছে না। আজকালকার মেয়েরা অনেক স্মার্ট হয়। এরা ফট করে বলে বসে — আপনি বসে-বসে পত্রিকা পড়ুন,

আমার কাজ আছে। এ তা বলতে পারছে না। আবার বসে থাকতেও ইচ্ছা করছে না। তার গায়ে ছেলেদের গায়ের চাদর। বয়স কত হবে — চব্বিশ-পঁচিশ? কমও হতে পারে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমার জন্যে হয়তো বয়স বেশি লাগছে। গায়ের রঙ শ্যামলা। রঙটা আরেকটু ভাল হলে মেয়েটিকে দারুণ রূপবতী বলা যেত। শীতের দিনে ঠাণ্ডা মেঝেতে মেয়েটা খালিপায়ে এসেছে। এটা ইন্টারেস্টিং। যেসব মেয়ে বাসায় খালিপায়ে হাঁটাহাঁটি করে তারা খুব নরম স্বভাবের হয় বলে আমি জানি।

এষা অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আমার পরীক্ষা আছে। আমি পড়তে যাব। একা একা বসে থাকতে কি আপনার খারাপ লাগবে?

'খারাপ লাগবে না। পত্রিকা থাকলে দিন, বসে বসে পত্রিকা পড়ি।'

'আমাদের বাসায় কোনো পত্রিকা রাখা হয় না।'

'ও, আচ্ছা।'

'টিভি দেখবেন, টিভি ছেড়ে দি?'

'আচ্ছা দিন।'

এষা টিভি ছাড়ল। ছবি ঠিকমতো আসছে না। ঝাপসা ঝাপসা ছবি।

এষা বলল, অ্যান্টেনার তার ছিঁড়ে গেছে বলে এই অবস্থা।

'আমার অসুবিধা হচ্ছে না।'

'আমি খুব লজ্জিত যে আপনাকে একা বসিয়ে রেখে চলে যেতে হচ্ছে।'

'লজ্জিত হবার কিছুই নেই।'

'আপনি কাইন্ডলি পাশের চেয়ারটায় বসুন। এই চেয়ারটা ভাঙা। হেলান দিলে পড়ে যেতে পারেন।'

আমি পাশের চেয়ারে বসলাম। কিছু-কিছু বাড়ি আছে-যার কোনো কিছুই ঠিক থাকে না। এটা বোধহয় সেরকম একটা বাড়ি। দেয়ালে বাঁকাভাবে ক্যালেন্ডার ঝুলছে, যার পাতা ওল্টানো হয়নি। ডিসেম্বর মাস চলছে — ধুলা জমে আছে। আমি ক্যালেন্ডার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালাম টিভির দিকে। নাটক হচ্ছে।

মাঝখান থেকে একটা নাটক দেখতে শুরু করলাম। এটা মন্দ না। পেছনে কি ঘটে গেছে আন্দাজ করতে করতে সামনে এগিয়ে যাওয়া — নাটকে একটি মধ্যবয়স্ক লোক তার স্ত্রীকে বলছে — এ তুমি কী বলছ সীমা? না না না। তোমার এ কথা আমি গ্রহণ করতে পারি না। বলেই ভেউ ভেউ করে মুখ বাঁকিয়ে কান্না।

সীমা তখন কঠিন মুখে বলছে — চোখের জলের কোনো মূল্য নেই ফরিদ। এ

পৃথিবীতে অশ্রু মূল্যহীন।

কিছুদূর নাটক দেখার পর মনে হল এরা স্বামী-স্ত্রী নয়। নাটকের স্ত্রীরা স্বামীদের নাম ধরে ডাকে না। সহপাঠী প্রেমিক-প্রেমিকা হতে পারে। মাঝবয়েসী প্রেমিক-প্রেমিকা ব্যাপারটায় একটু খটকা লাগছে। যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে নাটক দেখছি। মাঝখান থেকে নাটক দেখার এত মজা আগে জানতাম না। জিগ-স পাজল-এর মতো। পাজল শেষ করার আনন্দ পাওয়া যাচ্ছে। নাটক শেষ হল। মিলনান্তক ব্যাপার। শেষ দৃশ্যে সীমা জড়িয়ে ধরেছে ফরিদকে। ফরিদ বলছে — জীবনের কাছে আমরা পরাজিত হতে পারি না সীমা। ব্যাকগ্রাউন্ডে রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে — পাখি আমার নীড়ের পাখি। নাটকের শেষ দৃশ্যে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করার একটা নতুন স্টাইল শুরু হয়েছে — যার ফলে গানটা ভাল লাগে, নাটক ভাল লাগে না।

আমি টিভি বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছি। এ বাড়ির ড্রয়িংরুমে সময় কাটাবার মতো কিছু নেই। একটিমাত্র ক্যালেন্ডারের দিকে কতক্ষণ আর তাকিয়ে থাকা যায়!

দরজার কড়া নড়ছে। আমি দরজা খুললাম। স্যুট-টাই পরা এক ভদ্রলোক। ছেলেমানুষি চেহারা। মাথাভর্তি চুল। এত চুল আমি কারো মাথায় আগে দেখিনি। হাত বুলিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে। ভদ্রলোককে দেখে মনে হল দরজার কড়া নেড়ে তিনি খুবই বিব্রত বোধ করছেন। আমি বললাম, কি চাই?

ভদ্রলোক ক্ষীণ গলায় বললেন, এষা কি আছে?

'আছে। ওর পরীক্ষা। পড়াশোনা করছে।'

'ও, আচ্ছা।'

ভদ্রলোক মনে হল আরো বিব্রত হলেন। আরো সংকুচিত হয়ে গেলেন। আগের চেয়েও ক্ষীণ গলায় বললেন, আমি ওকে একটা কথা বলে চলে যাব।

'কথা বলতে রাজি হবে কিনা জানি না।'

'কাইন্ডলি একটু আমার কথা বলুন। বলুন মোরশেদ।'

'মোরশেদ বললেই চিনবে?'

'জ্বি।'

'ভেতরে এসে বসুন, আমি বলছি।'

'আমি ভেতরে যাব না। এখানেই দাঁড়াচ্ছি।'

'আচ্ছা দাঁড়ান — কি নাম যেন বললেন আপনার — মোরশেদ?'

'জ্বি, মোরশেদ।'

আমি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলাম। কি করা যায়? এখান থেকে এষা এষা করে ডাকা যায়। ডাকতে ইচ্ছা করছে না। সরাসরি বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলে কেমন হয়? এষা কোথায় পড়াশোনা করছে আমি জানি। ভেতরের বারান্দার এক কোণায় তার পড়ার টেবিল। দাদীমাকে ধরাধরি করে ভেতরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিতে গিয়ে আমি এষার পড়ার টেবিল দেখেছি। আগে যেহেতু একবার ভেতরে যেতে পেরেছি, এখন কেন পারব না? এষা রেগে যেতে পারে। রাগুক না! মাঝে–মাঝে রেগে যাওয়া ভাল। প্রচণ্ড রেগে গেলে শরীরের রোগজীবাণু মরে যায়। যারা ঘন ঘন রাগে তাদের অসুখবিসুখ হয় না বললেই চলে। আর যারা একেবারেই রাগে না, তারাই দু'দিন পরপর অসুখে ভোগে। সবচে' বড় কথা, এষাকে খানিকটা ভড়কে দিতে ইচ্ছা করছে। আমাকে চুপচাপ বসিয়ে সে দিব্যি পড়াশোনা করবে তা হয় না। একটু হকচকিয়ে দেয়া যাক।

আমি পর্দা সরিয়ে নিতান্ত পরিচিত জনের মতো ভেতরে ঢুকে গেলাম। এষা চেয়ারে পা তুলে বসেছে। বইয়ের উপর ঝুঁকে আছে। তার মনোযোগ এতই বেশি যে আমার বারান্দায় আসা সে টের পেল না। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বাচ্চা মেয়েদের মতো পড়তেই থাকল। আমি ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে খুব সহজ গলায় বললাম, এষা, মোরশেদ সাহেব এসেছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তোমার সঙ্গে একটা কথা বলেই চলে যাবেন।

এষা ভূত দেখার মতো চমকে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, ভদ্রলোককে কী চলে যেতে বলব? ভেতরে এসে বসতে বলেছিলাম, উনি রাজি হলেন না।

এষা কঠিন গলায় বলল, আপনি দয়া করে বসার ঘরে বসুন। আপনি হুট করে ঘরে ঢুকে গেলেন কী মনে করে?

আমি নিতান্তই স্বাভাবিক গলায় বললাম, ভদ্রলোককে কি বসতে বলব?

'তাঁকে যা বলার আমি বলব। প্লীজ, আপনি বসার ঘরে যান। আশ্চর্য, আপনি কী মনে করে ভেতরে চলে এলেন?'

আমি এষাকে হতচকিত অবস্থায় রেখে চলে এলাম। ভদ্রলোক বাইরে। সিগারেট ধরিয়েছেন। আমাকে দেখে আস্ত সিগারেট ফেলে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসলেন। আমি বললাম, ভেতরে গিয়ে বসুন, এষা আসছে।

'আমাকে বসতে বলেছে?'

'তা বলেনি, তবে আমার মনে হচ্ছে আপনি ভেতরে গিয়ে বসলে খুব রাগ

করবে না।'

'আমি বরং এখানেই থাকি?'

'আচ্ছা, থাকুন।'

আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তায় চলে এলাম। আপাতত রাস্তার দোকানগুলির কোনো-একটিতে চা খাব। ইতোমধ্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে এষার কথাবার্তা শেষ হবে — আমি আবার ফিরে যাব। ফিরে নাও যেতে পারি। এই জগৎ-সংসারে আগেভাগে কিছুই বলা যায় না।

শীতের রাতে ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা খাবার অন্যরকম আনন্দ আছে। চা খেতে-খেতে মাঝে-মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশের তারা দেখতে হয়। সারা শরীরে লাগবে কনকনে শীতের হাওয়া, হাতে থাকবে চায়ের কাপ। দৃষ্টি আকাশের তারার দিকে। তারাগুলিকে তখন মনে হবে শাদা বরফের ছোট-ছোট খণ্ড। হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছা করবে, কিন্তু ছোঁয়া যাবে না।

পরপর দু' কাপ চা খেয়ে তৃতীয় কাপের অর্ডার দিয়েছি, তখন দেখি মোরশেদ সাহেব হনহন করে যাচ্ছেন। মাটির দিকে তাকিয়ে এত দ্রুত আমি কাউকে হাঁটতে দেখিনি। আমি ডাকলাম — এই যে ভাই, মোরশেদ সাহেব!

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। খুবই অবাক হয়ে তাকালেন। নিতান্তই অপরিচিত কেউ নাম ধরে ডাকলে আমরা যেরকম অবাক হই — সেরকম অবাক। ভদ্রলোক আমাকে চিনতে পারছেন না। আশ্চর্য আত্মভোলা মানুষ তো! আমি বললাম, চা খাবেন মোরশেদ সাহেব?

'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'জ্বি-না।'

'একটু আগেই দেখা হয়েছে।'

ভদ্রলোক আরো বিস্মিত হলেন। আমি বললাম, এখন কি চিনতে পেরেছেন?

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, জ্বি জ্বি। মাথা নাড়ার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছি তিনি মোটেই চেনেননি। আমি বললাম — এষার সঙ্গে কথা হয়েছে?

'জ্বি, হয়েছে। এখন আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি এষার ছোটমামা। এষাকে ডেকে দিয়েছেন।'

'আপনার স্মৃতিশক্তি খুবই ভাল। আমি অবশ্যি এষার ছোটমামা না। সেটা কোনো বড় কথা না। এষা আপনার সঙ্গে কথা বলেছে। এটাই বড় কথা।'

'এষা কথা বলেনি।'

'কথা বলেনি?'

'জ্বি-না। আমাকে দেখে প্রচণ্ড রাগ করল। আপনি তো জানেন ও রাগ করলে কেঁদে ফেলে — কেঁদে ফেলল। তারপর বলল, বের হয়ে যাও। এক্ষুণি বের হও। আমি চলে এসেছি।'

'ভাল করেছেন। আসুন চা খাওয়া যাক।'

'আমি চা খাই না। চা খেলে রাতে ঘুম হয় না।'

'তা হলে চা না খাওয়াই ভাল। এষা আপনার কে হয়?'

'ও আমার স্ত্রী।'

'আমি তাই আন্দাজ করছিলাম। চলুন যাওয়া যাক।'

'চলুন।'

বড় রাস্তায় গিয়ে ভদ্রলোক রিকশা নিলেন। খিলগাঁ যাবেন। রিকশাওয়ালাকে বললেন, ১৩২ নম্বর খিলগাঁ, একতলা বাড়ি। সামনে একটা বড় আমগাছ আছে। রিকশাওয়ালাকে এইভাবে বাড়ির ঠিকানা দিতে আমি কখনো শুনিনি। তিনি রিকশায় উঠে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ছোটমামা, আপনি কোন দিকে যাবেন? আসুন আপনাকে নামিয়ে দি।

আমি এষার ছোটমামা নই। কিন্তু মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে এইসব বলা অর্থহীন। তাঁর মাথায় ছোটমামার কাঁটা ঢুকে গেছে। সেই কাঁটা দূর করা এত সহজে সম্ভব না। আমি বললাম, মোরশেদ সাহেব, আমি উল্টোদিকে যাব।

'আপনি এষাকে একটু বলবেন যে আমি সরি। একটা ভুল হয়ে গেছে। এরকম ভুল আর হবে না।'

'যদি দেখা হয় বলব। অবশ্যই বলব।'

'যাই ছোটমামা?'

'আচ্ছা, আবার দেখা হবে।'

আমি উল্টোদিকে হাঁটা ধরলাম। এষাদের বাড়িতে আবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। কি করব এখনো ঠিক করিনি। ঘণ্টাখানিক রাস্তায় হেঁটে মেসে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। রাতের খাওয়া এখনো হয়নি — কোথায় খাওয়া যায়? কুড়ি টাকার একটা নোট পকেটে আছে। অনেক টাকা। কুড়ি কাপ চা পাওয়া যাবে। একজন ভিখিরির দু' দিনের রোজগার। ঢাকা শহরে ভিখিরিদের গড় রোজগার দশ টাকা। এই তথ্য ইয়াদের কাছ থেকে পাওয়া। সে হল আমার বোকা বন্ধুদের একজন। ইয়াদের

অঢেল টাকা। টাকা বোকা মানুষকেও বুদ্ধিমান বানিয়ে দেয়। ইয়াদকে বুদ্ধিমান করতে পারেনি। ইয়াদদের পরিবারের যতই টাকা হচ্ছে, সে ততই বোকা হচ্ছে। ইয়াদ ভিখিরিদের উপর গবেষণা করছে। তার পিএইচ. ডি. থিসিসের বিষয় হল 'ভাসমান জনগোষ্ঠী ঃ আর্থ–সামাজিক নিরীক্ষার আলোকে'। ইয়াদকে অনেক ডাটা কালেক্ট করতে হচ্ছে। আমি তাকে সাহায্য করছি। সাহায্য করার মানে হল — তার একটা বিশাল পেটমোটা কালো ব্যাগ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো।

তার কালো ব্যাগে পাওয়া যাবে না এমন জিনিস নেই। কাগজপত্র ছাড়াও ছোট্ট একটা টাইপ রাইটার। বোতলে ভর্তি চিড়া–গুড়। ইনসটেন্ট কফি, চিনি, ফার্স্ট এইডের জিনিসপত্র। একগাদা লম্বা নাইলনের দড়িও আছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম — দড়ি কি জন্যে রে ইয়াদ? সে মুখ শুকনো করে বলেছে — কখন কাজে লাগে বলা তো যায় না। রেখে দিলাম। ভাল করিনি? ভাল করিনি — বলাটা ইয়াদের মুদ্রাদোষ। কিছু বলেই খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলবে — ভাল করিনি?'

রাত একটার দিকে মজনুর দোকানে ভাত খেতে গেলাম। ভাতের হোটেলের সাধারণত কোনো নাম থাকে না। এটার নাম আছে। নাম হল — "মজনু মিয়ার ভাত মাছের হোটেল।"

বিরাট সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ডের এক মাথায় একটা মুরগির ছবি, আরেক মাথায় ছাগলের ছবি। ভাত–মাছের ছবি নেই। মজনুর দোকানে ভাত খেতে যাওয়ার আদর্শ সময় হল রাত একটা। কাস্টমাররা চলে যায়। কর্মচারীরা দু'টা টেবিল একত্র করে গোল হয়ে খেতে বসে। ওদের সঙ্গে বসে পড়লেই হয়। মজনুর 'ভাত–মাছের হোটেলে'র ঝাঁপ ফেলে দেয়া হয়েছে। বয়–বাবুর্চি একসঙ্গে খেতে বসেছে। খাবার যা বাঁচে তাই শেষ সময়ে খাওয়া হয়। আজ ওদের ভাগ্য ভাল — রুই মাছ। খাসি দু'টাই বেঁচে গেছে। প্রচুর বেঁচেছে। শুধু ভাত নেই। অল্পকটা আছে, তাই একটা টিনের থালায় রাখা আছে। তরকারির চামচে এক চামচ করেও সবার হবে না। আমাকে দেখে এরা জায়গা করে দিল। মজনু মিয়া বিরসমুখে বললেন, হিমু ভাই রোজ দেরি করেন। আপনার মতো কাস্টমার না থাকা ভাল। বড়ই যন্ত্রণা।

আমি বললাম, ভাত নেই নাকি?

'যা আছে আপনার হয়ে যাবে। আপনে খান। ওরা মাছ, গোছ খাবে। এতবড় পেটি একটা খেলে পেট ভরে যায়।'

'খানিকটা ভাত রান্না করে ফেললে কেমন হয়?'

'হিমু ভাই, আপনি আর যন্ত্রণা করবেন না তো! রাত একটার সময় ভাত

রানবে?'

'অসুবিধা কি?'

'অসুবিধা আছে। চাল নাই। পোলাওয়ের চাল সামান্য আছে — সকালে বিরানী হবে। এই, খা তোরা। আমি চললাম। আর শুনেন হিমু ভাই, আপনার ঐ পাগলা বন্ধু ইয়াদ সাহেবকে আমার এখানে আসতে নিষেধ করে দিবেন। আজ একদিনে দুইবার এসেছে আপনার খোঁজে। দুইবারেই খুব যন্ত্রণা করেছে। বলে, চা দিন। দিলাম চা। বলে কাপ পরিষ্কার হয়নি। গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন, আমি ডাবল দাম দিব। দিলাম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে। চা মুখে দিয়ে থু করে ফেলে দিয়ে বলে — চিনি কম দিয়ে আরেক কাপ দিতে বলুন, আমি ডবল দাম দিব। কথায় কথায় ডবল দাম। আরে ডবল দাম চায় কে তার কাছে? এতগুলা কাস্টমারের সামনে যে থু করে চা ফেলল, আমার অপমান হল না? আপনি আপনার বন্ধুরে বলে দিবেন।

'ইয়াদকে আমি বলে দেব।'

'আজেবাজে লোককে হোটেল চিনায়ে দিয়েছেন, এরা জান শেষ করে দেয়।'

মজনু মিয়া ক্যাশ নিয়ে চলে গেল। টিনের থালায় এক থালা ভাত নিয়ে আমরা ছ'জন মানুষ চুপচাপ বসে আছি। বাবুর্চির নাম মোস্তফা। মোস্তফা বসেছে আমার পাশে। সে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। মোস্তফা বলল, হিমু ভাই, আফনে খান। রুই মাছটা ভাল ছিল। আরিচার মাছ। খেয়ে আরাম পাইবেন।

'আমি একা ভাত খাব, আপনারা শুধু তরকারি?'

'অসুবিধা কিছু নাই ভাইজান।'

'অসুবিধা আছে। চুলা ধরান, পোলাওয়ের চাল বসিয়ে দেন। পোলাও রান্না করে ফেলুন। ভাল মাছ আছে, পোলাও দিয়ে আরাম করে খাই।'

বাবুর্চি অন্যদের দিকে তাকাল। সবার চোখই চকচক করছে। আমি বললাম, মাছের তরকারি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গরম করতে হবে। চুলা তো ধরাতেই হবে।

মোস্তফা ক্ষীণ গলায় বলল, মালিক শুনলে খুবই রাগ হইব।

'শুনবে কেন? শুনবে না। তা ছাড়া আগামী দু' দিন মালিক দোকানে আসবে না।'

'পোলাও বসাইয়া দিমু?'

'দিন।'

'সকালের জইন্যে মুরগি কোটা আছে। মোরগ-পোলাও বসাইয়া দিমু ভাইজান?'

'আইডিয়া মন্দ না। যাহা বাহান্ন তাহা পঁয়ষট্টি। পোলাও যখন হচ্ছে মোরাগ পোলাওয়ে অসুবিধা কি! কতক্ষণ লাগবে?'

'ডাবল আগুন দিয়ে রানলে আধা ঘণ্টার মামলা ভাইজান।'

'দিন ডাবল আগুন। সিঙ্গেল আগুনে আজকাল কিছু হয় না।'

মজনু মিয়ার ভাত-মাছের দোকানের কর্মচারীদের চোখ-মুখ আনন্দে ঝলমল করতে লাগল। আমি বললাম, রান্নাবান্না হোক, আমি আধ ঘণ্টা পর আসব।

'চা বানাইয়া দেই ভাইজান? বইসা বইসা গরম চা খান।'

'চা খেয়ে খিদে নষ্ট করব না। ভাল-ভাল জিনিস রান্না হচ্ছে।'

আমি চলে গেলাম তরঙ্গিণী ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। ডাকাডাকি করে মুহিব সাহেবের ঘুম ভাঙালাম। তিনি স্টোরের ভেতরই ঘুমান। মুহিব সাহেব দরজা খুলে সহজ গলায় বললেন, কি দরকার হিমুবাবু?

'ছ' বোতল ঠাণ্ডা কোক দিন তো!'

মুহিব সাহেব ছ'টা বোতল পলিথিনের ব্যাগে করে নিয়ে এলেন। একবারও জিজ্ঞেস করলেন না, রাত দেড়টায় কোক কি জন্যে।

'মুহিব সাহেব, সঙ্গে টাকা নেই। টাকা পরে দিয়ে যাব।'

'জ্বি আচ্ছা। আপনি আমার জন্যে একটু দোয়া করবেন হিমু ভাই। খাসদিলে দোয়া করবেন।'

'আবার কি হল?'

'কিছু হয়নি। এম্নি বললাম। আজ আপনার জন্মদিন। একটা শুভদিন।'

'জন্মদিন আপনি জানতেন?'

'জানব না কেন? জানি। সকালবেলা একবার আপনার কাছে যাব ভেবেছিলাম — যেতে পারিনি। ছুটি পেলাম না। যাক, তবু শুভদিনে শেষ পর্যন্ত দেখা হল।'

'শুভদিনে দেখা হয়নি মুহিব সাহেব — এখন প্রায় দু'টা বাজতে চলল। জন্মদিনের মেয়াদ শেষ। যাই — '

মুহিব সাহেব দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। ছ' বোতল কোক নিয়ে আমি বের হয়ে এলাম। মজনু মিয়ার ভাত-মাছের হোটেলের লোকজন নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। ভাল শীত পড়েছে। শীতের সময় সবাই খুব দ্রুত হাঁটে। আমি ধীরে-ধীরে এগুচ্ছি। গায়ে শীত মাখিয়ে হাঁটতে ভাল লাগছে। রাতে হাঁটার সময় আপনাতেই আকাশের দিকে চোখ যায়। প্রাচীন কালে মানুষ আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ ভ্রমণে বেরুত। সব মানুষই বোধহয় সেই প্রাচীন স্মৃতি তার 'জীনে' বহন করে।

২

ঘরের ভেতর দু'টা চিঠি। একটির খাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে রূপার কাছে থেকে এসেছে। কার্টিস পেপারে ধবধবে শাদা খাম। খামের এক মাথায় রূপালি কালিতে এমবস করা রূপার নাম। শাদার উপর রূপালি ফোটে না, তবু এটাই রূপার স্টাইল। অন্য চিঠিটি ব্রাউন কাগজের। ঠিকানা ইংরেজিতে টাইপ করা। দু'টা চিঠির কোনোটিতেই স্ট্যাম্প নেই — হাতে-হাতে পৌঁছে দেয়া। আমি রূপার চিঠি পকেটে রেখে অন্যটা খুললাম।

যা ভেবেছি তাই — ইয়াদের লেখা। টাইপ করা চিঠি। ইংরেজি ভাষায় — টেলিগ্রামের ধরনে লেখা।

হিমু, খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় আছ?
ভিডিও ক্যামেরা কিনেছি। সব ভিডিও হবে।
ইয়াদ।

ঘরে থাকলেই ইয়াদের হাতে পড়তে হবে। সারা দিনের জন্যে আটকে যেতে হবে। আমার কাজ হবে তার পেটমোটা কালো ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো — এখন যেহেতু ভিডিও ক্যামেরা কেনা হয়েছে — ভিক্ষুকদের ইন্টারভ্যু হবে ভিডিওতে। এতদিন ক্যাসেট রেকর্ডারে হচ্ছিল। ইয়াদের কাজকর্ম পরিষ্কার। তৈরি প্রশ্নমালা আছে — ইন্টারভ্যুর সময় তৈরি প্রশ্নমালার বাইরে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। প্রশ্নের নমুনা হল —

নাম?
স্ত্রী না পুরুষ?
বয়স?
শিক্ষা?
পিতার নাম?
ঠিকানা ক) স্থায়ী?
খ) অস্থায়ী?

কতদিন ধরে ভিক্ষা করছেন?

দৈনিক গড় আয়?

পরিবারের সদস্য সংখ্যা?

সদস্যদের মধ্যে কতজন ভিক্ষুক?

খাবার রান্না করে খান, না ভিক্ষালব্ধ খাবার খান?

এরকম মোট পঞ্চাশটা প্রশ্ন। একেকজনের উত্তর দিতে ঘণ্টাখানিক লাগে। এক ঘণ্টার জন্যে তাকে পাঁচ টাকা দেয়া হয়। পাঁচ টাকার চকচকে একটা নোট হাতে নিয়ে অধিকাংশ ভিক্ষুকই চোখ কপালে তুলে বলে, অতক্ষণ খাটনি করাইয়া এইডা কী দিলেন? আফনের বিচার নাই?

আমি ইয়াদকে বলার চেষ্টা করেছি, এ-জাতীয় প্রশ্ন অর্থহীন। ইয়াদ তা মানতে রাজি নয়। সে নাকি তিন মাস দিনরাত খেটে প্রশ্ন তৈরি করেছে। প্রশ্ন তৈরির আগে স্ট্যাটিসটিক্যাল মডেল দাঁড়া করিয়েছে। কম্প্যুটার সফটওয়ারে পরিবর্তন করেছে — ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তার বকবকানি শুনে বিরক্ত হয়ে বলেছি, চুপ কর্ গাধা। সে খুবই অবাক হয়ে বলেছে — গাধা বলছিস কেন? আমাকে গাধা বলার পেছনে তোর কি কি যুক্তি আছে তুই পয়েন্ট ওয়াইজ কাগজে লিখে আমাকে দে। আমি ঠাণ্ডা মাথায় অ্যানালাইসিস করব। যদি দেখি তোর যুক্তি ঠিক না, তা হলে আমাকে গাধা বলার জন্যে তোকে লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

এ-জাতীয় মানুষদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। আমি সবসময় দূরে থাকার চেষ্টাই করি। আমি পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াই। গাধাটা আমাকে খুঁজে-খুঁজে বের করে। একধরনের চোর-পুলিশ খেলা। আমি চোর — সে পুলিশ। যেহেতু চোরের বুদ্ধি সবসময়ই পুলিশের বুদ্ধির চেয়ে বেশি, সেহেতু সে গত এক সপ্তাহ আমার দেখা পায়নি। আজো পাবে না। আমি আবার বের হয়ে পড়লাম। আমার কোনোরকম পরিকল্পনা নেই। প্রথমে রূপার কাছে যাওয়া যায়। ওর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না। প্রিয় মুখ কিছুদিন পরপর দেখতে হয়। মানুষের মস্তিষ্ক অপ্রিয়জনদের ছবি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। প্রিয়জনদের ছবি কোনো এক বিচিত্র কারণে কখনো সাজায় না। যে জন্যে চোখ বন্ধ করে প্রিয়জনদের চেহারা কখনোই মনে করা যায় না।

রূপাকে পাওয়া গেল না। রূপার বাবার সঙ্গে দেখা হল। তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন — ও তো ঢাকায় নেই।

এই ভদ্রলোক সহজ গলায় মিথ্যা বলেন। রূপা ঢাকায় আছে তা তাঁর কথা থেকেই আমি বুঝতে পারছি।

আমি বললাম, কোথায় গেছে?

'সেটা জানার কি খুব প্রয়োজন আছে?'

'না, প্রয়োজন নেই — তবু জানতে ইচ্ছা করছে।'

'ও যশোর গিয়েছে।'

'ঠিকানাটা বলবেন?'

ভদ্রলোক শুকনো গলায় বললেন, ঠিকানা দিতে চাচ্ছি না। ও অসুস্থ । আমরা চাই না অসুস্থ অবস্থায় কেউ ওকে বিরক্ত করে।

'অসুস্থ অবস্থায় মানুষের বন্ধুবান্ধবের প্রয়োজন পড়ে। আমি ওর খুব ভাল বন্ধু।

'ওর ঠিকানা দেয়া যাবে না।'

'ও কোথায় গেছে বললেন যেন?'

'যশোর।'

'খুব শিগ্‌গির ফেরার সম্ভাবনা নেই — তাই না?'

'দেরি হবে।'

আমি খুব চিন্তিত মুখে বললাম, একটা ঝামেলা হয়ে গেল যে! আজই প্রেস ক্লাবের সামনের রাস্তায় রূপার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। সে-ই আমাকে বাসায় আসতে বলেছে। ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনি বলেছেন রূপা যশোরে। আপনার মতো বয়স্ক, দায়িত্ববান একজন মানুষ আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই মিথ্যাকথা বলবেন না। তাহলে রূপার সঙ্গে দেখা হল কী ভাবে?

ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন। কিছু বললেন না। তাঁকে মোক্ষম আঘাত করা হয়েছে। সামলে উঠতে সময় লাগবে। তাঁর মুখের ভাবের পরিবর্তন দেখতে ভাল লাগছে।

'তোমার নাম হিমু না?'

'জ্বি।'

'মিথ্যা যা বলার তুমি বলেছ। রূপার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি, ও যশোরে আছে। আমার সঙ্গে তুমি যে ক্ষুদ্র রসিকতা করার চেষ্টা করলে তা আর করবে না। মনে থাকবে?'

'জ্বি স্যার, থাকবে।'

'গেট আউট।'

'থ্যাংক ইউ স্যার।'

আমি চলে এলাম। এমন কঠিন ধরনের একজন মানুষ রূপার মতো মেয়ের বাবা কী করে হলেন ভাবতে-ভাবতে আমি হাঁটছি — রূপার চিঠি এখনো পড়া হয়নি। পড়লে তো ফুরিয়ে গেল। চিঠির এই হল ম্যাজিক। যতক্ষণ পড়া হয় না, ততক্ষণ ম্যাজিক থাকে। পড়ামাত্রই ম্যাজিক ফুরিয়ে যায়।

কোথায় যাওয়া যায়? মেসে ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ইয়াদ সেখানে নিশ্চয়ই বসে আছে। আমি মোরশেদ সাহেবের বাসার দিকে রওনা হলাম। খিলগাঁ — দূর আছে। অনেকক্ষণ হাঁটতে হবে। কোনো-একটা উদ্দেশ্য সামনে রেখে হাঁটতে ভাল লাগে। যদিও জানি মোরশেদ সাহেবকে পাওয়া যাবে না। কোনো-কোনো দিন এমন যায় যে কাউকেই পাওয়া যায় না। আজ বোধহয় সেরকম একটা দিন।

মোরশেদ সাহেবকে পাওয়া গেল না। দরজা তালাবন্ধ। তবে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করলাম। বাসার ঠিকানা বলার সময় তিনি বলেছিলেন — ১৩২ নং খিলগাঁ, একতলা বাড়ি, সামনে বিরাট আমগাছ। সবই ঠিক আছে, শুধু আমগাছ নেই। শুধু এই বাড়ি না, আশেপাশের কোনো বাড়ির সামনেই আমগাছ নেই। মোরশেদ সাহেবের বাড়িতে দারোয়ান জাতীয় একজনকে পাওয়া গেল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম — এখানে কি আমগাছ কখনো ছিল? সে বিরক্ত হয়ে বলল, আমগাছ কেন থাকবে?

যেন আমগাছ থাকাটা অপরাধ। আমি খুবই বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আপনি এ বাড়িতে কতদিন ধরে আছেন?

'ছোটবেলা থাইক্যা আছি।'

'এটা কি মোরশেদ সাহেবের কেনা বাড়ি?'

'জ্বে না, ভাড়া বাসা। তয় বেশিদিন থাকব না। বাড়িওয়ালা নোটিশ দিছে।'

'আচ্ছা ভাই, যাই।'

'উনারে কিছু বলা লাগব?'

'না।'

আমি আবার হাঁটা ধরলাম। রাত একটা পর্যন্ত পথে-পথে থাকতে হবে। ইয়াদ একটা পর্যন্ত আমার জন্যে বসে থাকবে না। তাকে রাত বারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। নীতুর কঠিন নির্দেশ। নীতুর মতো মেয়ের নির্দেশ অগ্রাহ্য করা ইয়াদের পক্ষে সম্ভব না।

নীতুর সঙ্গে দেখা করে এলে কেমন হয়? ইয়াদের হাত থেকে বাঁচার সবচে'

ভাল উপায় হচ্ছে ইয়াদের বাসায় গিয়ে বসে থাকা। সে বসে থাকবে আমার মেসে, আমি বসে থাকব তার বাড়িতে। চোর-পুলিশ খেলার এরচে' ভাল স্ট্র্যাটিজি আর হয় না। ফুল প্রুফ।

ইয়াদের বাড়ি একটা হুলস্থুল ব্যাপার। বাইরে থেকে মনে হয় জেলখানা। গেটটাও এমন যে বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। বড় গেট কখনো খোলা হয় না। বড় গেটের সঙ্গে আছে একটা খোকা গেট। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর সেটা খোলা হয়। বাড়িতে ঢুকতে হয় মাথা নিচু করে। একবার ঢোকার পর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বের হয়ে যেতে ইচ্ছা করে — কারণ তীব্র বেগে দু'টা অ্যালসেশিয়ান ছুটে আসে। এদের একজন কুচকুচে কালো, অন্যজন ধবধবে শাদা। রঙ ভিন্ন হলেও এদের স্বভাব অভিন্ন, দু'জন ভয়ংকর হিংস্র, এদের একজনের নাম টুটি, অন্যজনের নাম ফুটি। দারোয়ান বলে — চুপ টুটি-ফুটি। এরা চুপ করে, তবে এমনভাবে তাকায় যাতে মনে হয় যে-কোনো সুযোগে এরা ঘাড় কামড়ে ধরবে।

গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত যেতে খানিকক্ষণ বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হয়। সেই বাগানও দারুণ বাগান। এদের বাড়ি দোতলা — সিঁড়ি মার্বেল পাথরের। বাড়ির বারান্দায় ইউ আকৃতিতে কিছু বেতের চেয়ার বসানো। মনে হয় প্রতিদিন চেয়ারগুলিতে রঙ করা হয়, কারণ যখনি আমি দেখি — ঝকঝক করছে। চেয়ারের গদিগুলির রঙ হালকা সবুজ। শাদা ও সবুজে যে এত সুন্দর কম্বিনেশন হয় তা ইয়াদদের বাড়িতে না এলে কখনো জানতে পারতাম না।

ঠিক মাঝখানের বেতের চেয়ারে নীতু বসে ছিল। নীতু হল নায়িকা-স্বভাবের মেয়ে। সব সময় সেজেগুজে থাকে এবং নায়িকাদের মতো চোখে থাকে সানগ্লাস। দিন-রাত সব সময়ই সানগ্লাস। তাকে যখনি দেখি তখনি মনে হয় — সে পার্টিতে যাচ্ছে, কিংবা পার্টি থেকে ফিরেছে। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এই মেয়েটিকে একবার আমার দেখতে ইচ্ছা করে। সেটা বোধহয় সম্ভব না। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল, হাসিমুখে বলল — যাক, আপনাকে তা হলে পাওয়া গেল! ও খুব ব্যাকুল হয়ে আপনাকে খুঁজছে।

'ব্যাপার কি খোঁজ নিতে এলাম।'

'ব্যাপার কি আমি জানি না, ভিক্ষুক সম্পর্কিত কিছু হবে। আমি জানতেও চাইনি। আপনাকে এমন লাগছে কেন?'

'কেমন লাগছে?'

'মনে হচ্ছে ম্যানহোলের গর্তের কাজ করছিলেন — কাজ বন্ধ করে বেড়াতে এসেছেন। ফিরে গিয়ে আবার কাজ শুরু করবেন।'

'এতটা খারাপ?'

'হ্যাঁ, এতটাই খারাপ। আপনি কি গোসল করেন, না করেন না?'

'শীতের সময় কম করি —।'

'বাথটাবে গরম পানি দিলে আপনি কি গোসল করবেন?'

'আমার প্রয়োজন নেই। নোংরা থাকতে ভাল লাগছে।'

'নোংরা থাকতে ভাল লাগছে মানে! এটা কী ধরনের কথা?'

'রসিকতা করার চেষ্টা করছি।'

নীতু ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, রসিকতা বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না। আপনি আসলেই নোংরা থাকতে ভালবাসেন। যাই হোক — আমার জন্যে হলেও দয়া করে পরিষ্কার-পরিছন্ন হয়ে আসুন। আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলি। আপনাকে নতুন একসেট কাপড় দিচ্ছি। গায়ের কাপড় বাথরুমে রেখে আসবেন। ইস্ত্রি করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

আমি হাসলাম। নীতু বলল, হাসবেন না। হাসির কোনো কথা বলিনি। যান, বাথরুমে ঢুকে পড়ুন। কুইক।

একদল মানুষ আছে — বাথরুমপ্রেমিক। তারা অন্য কিছুতেই মুগ্ধ হয় না, বাথরুম দেখে মুগ্ধ হয়। আমি সেই দলে পড়ি না, কিন্তু ইয়াদের বাড়ির বাথরুমে ঢুকে খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে মনে-মনে বলি — 'এ কী!' আজ আবার বললাম। বাথটাবভর্তি পানি। সেই বাথটাব এত বড় যে ইচ্ছা করলে সাঁতার কাটা যায়। ডুব দেয়া যায়। গোসল করতে-করতে 'সংগীত শ্রবণের' ব্যবস্থা আছে। সংগীতের কনট্রোল অবশ্যি বাইরে। যে-রেকর্ড বাজানো হবে, স্পীকারের মাধ্যমে তা চলে আসবে বাথরুমে। এখন গান হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে আহত হতেন, কারণ বাথটাবে শুয়ে আমি শুনছি তাঁর মায়ার খেলা। সখী বলছে,

ওগো কেন, ওগো কেন মিছে এ পিপাসা।
আপনি যে আছে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কী অভাব আছে —
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ, কোকিল কূজিত কুঞ্জ।

প্রায় ঘণ্টাখানিক বাথরুমে কাটিয়ে আমি বের হয়ে এলাম। গায়ে ধবধবে শাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি, একটা হালকা নীল উলের চাদর। পায়ে দিয়েছি চটিজুতো।

সেগুলিও নতুন। আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেরই লজ্জা লাগছে। নীতু বলল, বাহ্, আপনাকে ভাল দেখাচ্ছে! আসুন, চা খেতে আসুন।

বিভিন্ন খাবারের জন্যে এদের বিভিন্ন ঘর আছে। চা খাবার জন্যে আছে টী-রুম। আমরা দু'জন টী-রুমে বসলাম। পটভর্তি চা। সঙ্গে অ্যাশট্রে এবং টিনভর্তি সিগারেট। নীতু বলল, চা নিন। সিগারেট নিন। যাবার সময় টিনটা নিয়ে যাবেন। এটা আপনার জন্যে।

'আচ্ছা, নিয়ে যাব।'

'এখন আপনার সঙ্গে আমি কিছুক্ষণ খোলামেলা কথা বলব। যা জানতে চাইব আপনি দয়া করে উত্তর দেবেন।'

'দেব।'

'ইয়াদ আপনার কী রকম বন্ধু?'

'ভাল বন্ধু।'

'ভাল বন্ধু যদি হয় তাহলে ওকে আপনি গাধা বলেছিলেন কেন?'

'গাধা একধরনের আদরের ডাক। অপরিচিত বা অর্ধ-পরিচিতদের গাধা বলা যাবে না। বললে মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে। প্রিয় বন্ধুদেরই গাধা বলা যায়। এতে প্রিয় বন্ধুরা রাগ করে না। বরং খুশি হয়।'

'আপনি কি জানেন ইয়াদ অন্য দশজনের মতো নয়? সে সবকিছু সিরিয়াসলি নেয়। আপনি গাধা বলায় সে সারা রাত ঘুমায়নি — জেগে বসে ছিল — একটা খাতায় নোট করছিল কেন তাকে গাধা বলা যাবে না।'

'আমি হাসতে-হাসতে বললাম, সে যা করছিল গাধা বলার জন্যে তা কি যথেষ্ট নয়?'

'না, যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যতে কখনো তাকে গাধা বলবেন না এবং তার মাথায় কোনো অদ্ভুত আইডিয়া ঢুকিয়ে দেবেন না।'

'আমি ওর মাথায় কোনো অদ্ভুত আইডিয়া ঢোকাইনি।'

'ঢুকিয়েছেন — আপনি ওকে বলেছেন ভিক্ষুকদের জানতে হলে ভিক্ষুক হতে হবে। ওদের সঙ্গে থাকতে হবে। ওদের মতো ভিক্ষা করতে হবে। বলেননি এমন কথা?'

'বলেছি।'

'আপনি তা বিশ্বাস করেন?'

'করি।'

'তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, কেউ যদি পিঁপড়াদের সম্পর্কে গবেষণা করতে চায়, তা হলে তাকে পিঁপড়া হতে হবে, এবং পিঁপড়াদের সঙ্গে থাকতে হবে, পিঁপড়াদের খাবার খেতে হবে?'

'ওদের ভালমতো জানতে হলে তাই করতে হবে, কিন্তু সে উপায় নেই। ভিক্ষুকদের ব্যাপারে উপায় আছে। তা ছাড়া পিঁপড়া মানুষ না, ভিক্ষুকরা মানুষ।'

'আমি যে আপনাকে কী পরিমাণ অপছন্দ করি তা কি আপনি জানেন?'

'না, জানি না।'

'মাকড়সা আমি যতটা অপছন্দ করি আপনাকে তারচেয়ে বেশি অপছন্দ করি। আজ আমি বারান্দায় বসে ছিলাম। আপনি যখন আসছিলেন তখন ইচ্ছা করছিল— টুটি-ফুটিকে বলি— ধর্ ঐ লোকটাকে, ছিঁড়ে টুকুরো-টুকরো করে ফেল্। বলেই ফেলতাম। নিজেকে সামলেছি। আমি নিজেকে কনট্রোল করেছি। আজ যা করেছি অন্য একদিন যে তা করতে পারব তা তো না। একদিন হয়তো সত্যি কুকুর লেলিয়ে দেব। নিন, আরেক কাপ চা খান।'

আমি আরেক কাপ চা নিলাম। নীতু বলল, আপনার সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। আপনি নাকি মহাপুরুষজাতীয় মানুষ। মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। আমি তার একবিন্দুও বিশ্বাস করি না।

'আমি নিজেও করি না।'

'কিন্তু কেউ-কেউ করে। আপনার অদ্ভুত জীবনযাপন প্রণালীর জন্যেই করে। নোংরা কাপড় পরে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেই মানুষ মহাপুরুষ হয় না। যদি হত, তা হলে ঢাকা শহরে তিন লক্ষ মহাপুরুষ থাকত। এই শহরে রাস্তায় ঘুরে-বেড়ানো মানুষের সংখ্যা তিন লক্ষ। বুঝতে পারছেন?'

'পারছি।'

'আপনার কোনো ক্ষমতা নেই তা বলছি না। একটা ক্ষমতা আছে। ভালই আছে। সেটা হল — সুন্দর করে কথা বলা। আপনি যা বলেন তা-ই সত্যি বলে মনে হয়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। এই ক্ষমতা নিম্নশ্রেণীর ক্ষমতা। রাস্তায়-রাস্তায় যারা অষুধ বিক্রি করে তাদেরও এই ক্ষমতা আছে। আপনি যদি দাঁতের মাজন কিংবা সর্বব্যথানিবারণী অষুধ বিক্রি করেন তাহলে বেশ ভাল বিক্রি করবেন।'

নীতুর সঙ্গে অন্যদের এক জায়গায় বেশ ভাল অমিল আছে। রাগের কথা বলতে-বলতে অন্যদের রাগ পড়ে যায়। নীতুর পড়ে না। তার রাগ বাড়তেই থাকে। আস্তে-আস্তে মুখ লাল হতে থাকে। একসময়—সারা মুখ লাল টকটকে হয়ে যায়।

এখন যেমন হয়েছে। নীতু বলল, আমি অনেক কথা বললাম, আপনি তার উত্তরে কিছু বলতে চাইলে বলতে পারেন।

'আমি কিছু বলতে চাচ্ছি না।'

'তা হলে আপনি কি স্বীকার করে নিলেন, আমি যা বললাম সবই সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'ইন দ্যাট কেইস আপনি কি আমার পরামর্শ শুনবেন?'

'হ্যাঁ, শুনব।'

'আপনি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলুন। আপনার মধ্যে যেসব অস্বাভাবিকতা আছে — একজন ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট তা দূর করতে পারবে। আপনি অনেক দিন থেকেই মহাপুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। অভিনয় করতে-করতে আপনার ধারণা হয়েছে আপনি একজন মহাপুরুষ।'

'এরকম কোনো ধারণা আমার হয়নি।'

'হয়েছে। ইয়াদের কাছে শুনেছি আপনি মজনু মিয়ার মাছ-ভাতের হোটেল নামে একটা হোটেলে ভাত খান। সেখানে এক রাতে বললেন — হোটেলের মালিক দু' দিন হোটেলে আসবে না। এবং এই বলে কর্মচারীদের প্ররোচিত করলেন রোস্ট, পোলাওটোলাও রাঁধার জন্যে। করেননি?'

'হ্যাঁ, করেছি।'

'এগুলি হচ্ছে মহাপুরুষ সিনড্রম। নিজেকে আপনি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভাবতে শুরু করেছেন।'

'মজনু মিয়া কিন্তু দু' দিন ঠিকই হোটেলে আসেনি।'

'তা আসেনি। কাকতালীয় ব্যাপার। মাঝে-মাঝে কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে। কেউ-কেউ সেসব ব্যাপার কাজে লাগাতে চেষ্টা করে, যেমন আপনি করেছেন। আপনি একজন অসুস্থ মানুষ। আপনার চিকিৎসা হওয়া দরকার।'

আমি হাই তুলতে-তুলতে বললাম, আমি চিকিৎসা করাব। আপনি সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানা দিন।

'সত্যি করাবেন?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'আমার কাছে কার্ড আছে। কার্ড দিয়ে দিচ্ছি। আমি টেলিফোনেও উনার সঙ্গে কথা বলে রাখব।'

'আচ্ছা। আজ তা হলে উঠি?'

'আপনার বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করবেন না?'

আমি হাই তুলতে-তুলতে বললাম, ও আজ রাতে ফিরবে না। নীতু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তার মানে কি? আপনি কী বলতে চাচ্ছেন? আপনি কি আপনার তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার নমুনা আমাকে দেখাতে চাচ্ছেন? আমাকে ভড়কে দিতে চাচ্ছেন?

'তা না। আপনি শুধুশুধু রাগ করছেন। আমার মনে হচ্ছে ইয়াদ আজ রাতে বাসায় ফিরবে না। বললাম।'

'শুনুন হিমু সাহেব, আমার সঙ্গে চালাকি করতে যাবেন না। আমি চালাকি পছন্দ করি না।'

নীতু আমাকে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। টুটি-ফুটি বারান্দায় বসে ছিল। নীতুকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। লেজ নাড়তে লাগল। লেজ নাড়া দিয়ে কুকুর কী বোঝাতে চেষ্টা করে? লেজ নেড়ে সে কি বলে — আমি তোমাকে ভালবাসি? ভালবাসার পরিমাণও কি সে লেজ নেড়ে প্রকাশ করে? কেউ কি এই বিষয়টি নিয়ে রিসার্চ করেছে? ইয়াদের মতো কেউ একজন এসে ব্যাপারটা নিয়ে রিসার্চ করলেই পারে। 'কুকুরের লেজ এবং ভালবাসা'।

আমি মেসে ফিরলাম না। এত সকাল-সকাল ফেরা ঠিক হবে না। ইয়াদ হয়তো বসে আছে। রাস্তায় হাঁটতেও ইচ্ছা করছে না। ক্লান্তি লাগছে। কেন জানি মাথায় ভোঁতা ধরনের যন্ত্রণা হচ্ছে। মেসে ফিরে যাওয়াই ভাল। মাথার এই যন্ত্রণা ইদনীং আমাকে কাবু করে ফেলছে। হালকাভাবে শুরু হয় — শেষের দিকে ভয়াবহ অবস্থা! এক সময় ইচ্ছা করে কাউকে ডেকে বলি, ভাই, আপনি আমার মাথাটা ছুরি দিয়ে কেটে শরীর থেকে আলাদা করে দিতে পারেন? রূপার চিঠি এখনো পড়া হয়নি। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে চিঠিটা পড়া যায়। আমি একটা রিকশা নিয়ে নিলাম।

ইয়াদ আমার জন্যে মেসে বসে নেই। এটা একটা সুসংবাদ। আগের মতো টাইপ করা ইংরেজি নোট রেখে গেছে —

'খুঁজে পাচ্ছি না। জরুরি প্রয়োজন।
দয়া করে যোগাযোগ কর। ভিডিও
ক্যামেরা কিনেছি।
ইয়াদ।'

দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ার সময় মনে হল রূপার চিঠি আমার সঙ্গে নেই।

নীতুদের বাসায় পুরানো কাপড়ের সঙ্গে ফেলে এসেছি। কাপড়গুলি ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই ধোপার বাড়িতে চলে গেছে।

মাথার যন্ত্রণা বাড়ছে। এই অসহ্য তীব্র যন্ত্রণার উৎস কি? তীব্র আনন্দ যিনি দেন, তীব্র ব্যথাও কি তাঁরই দেয়া? কিন্তু তা তো হবার কথা না। যিনি পরম মঙ্গলময়, ব্যথা তাঁর সৃষ্টি হতে পারে না।

পাশের ঘরে হৈচৈ হচ্ছে। তাসখেলা হচ্ছে নিশ্চয়ই। আজ বৃহস্পতিবার। সপ্তাহে এই একটা দিন মেসে তাসখেলা হয়। শুধু তাস না, অতি সস্তার বাংলা মদ আনা হয়। যাঁরা এই জিনিস খান না, তাঁরাও দু'-এক চুমুক খান। সারা রাতই তাঁদের আনন্দিত কথাবার্তা শোনা যায়। এই আনন্দও কি তাঁর দেয়া?

৩

ধুম-ধুম করে দরজায় কিল পড়ছে।

আমি ঘুমের ঘোরে বললাম, কে? কেউ জবাব দিল না। দরজায় শব্দ হতে থাকল। আমার সমস্যা হচ্ছে — শীতের ভোরে একবার লেপের ভেতর থেকে বের হলে আবার ঢুকতে পারি না। এখনো ঠিকমতো ভোর হয়নি — চারদিক আঁধার হয়ে আছে। কাঁচের জানালায় গাঢ় কুয়াশা দেখা যাচ্ছে। এত ভোরে আমার কাছে আসার মতো কে আছে ভাবতে-ভাবতে দরজা খুলে দেখি — ইয়াদ। এই প্রচণ্ড শীতে তার গায়ে একটা ট্রাকিং স্যুট। পায়ে কেড্‌স্ জুতা। নিশ্চয় দৌড়ে এসেছে। চোখ-মুখ লাল। বড়-বড় করে শ্বাস নিচ্ছে। ইয়াদ বলল, জগিং করতে বের হয়েছিলাম। ভাবলাম, একটা চান্স নিয়ে দেখি তোকে পাওয়া যায় কিনা। কতবার যে এসেছি তোর খোঁজে। এই ক'দিন কোথায় ছিলি?

আমি জবাব না দিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলাম। বাথরুমের দরজা ঠেলে ইয়াদও ঢুকে গেল। আমি মুখে পানি দিচ্ছি। ইয়াদ পাশে। সে বলল, ছিলি কোথায় তুই? ইয়াদের স্বভাব-চরিত্রের একটি ভাল দিক হচ্ছে অধিকাংশ প্রশ্নেরই সে কোনো জবাব শুনতে চায় না। প্রশ্ন করা প্রয়োজন বলেই প্রশ্ন করে। জবাব দিলে ভাল, না দিলে ক্ষতি নেই। সে প্রশ্ন করে যাবে তার মনের আনন্দে।

'হিমু!'

'কি?'

'কাল রাতে আমার বউকে তুই খামোকা ভয় দেখালি কেন?'

'ভয় দেখিয়েছি?'

'অফকোর্স ভয় দেখিয়েছিস — তুই তাকে বললি আমি নাকি রাতে ফিরব না। এদিকে আমি সত্যি-সত্যি আটকা পড়ে গেলাম ছোটখালার বাসায়। ফিরতে ফিরতে রাত দু'টা বেজে গেছে। এসে দেখি নীতুর মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে — পরিচিত-অপরিচিত সব জায়গায় টেলিফোন করা হয়েছে। ম্যানেজারকে পাঠানো হয়েছে সব হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে আসতে। ম্যানেজার ব্যাটা গাড়ি নিয়ে বের হয়ে, সেই গাড়ি ড্রেনে ফেলে দিয়েছে।

'এই অবস্থা?'

'হ্যাঁ, এই অবস্থা। নীতুর হাইপারটেনশান আছে। অল্পতেই এমন নার্ভাস হয়। ওর একজন পোষা সাইকিয়াট্রিস্ট আছে। দু'দিন পরপর তার কাছে যায়। একগাদা করে টাকা দিয়ে আসে।'

'তোর তো টাকা খরচ করার পথ নেই — কিছু খরচ হচ্ছে, মন্দ কি?'

'টাকা কোনো সমস্যা না, নীতুই সমস্যা। অল্পতেই এত আপসেট হয় — এই কারণেই তোকে খুঁজছি। নীতুকে সামলানোর ব্যাপারে কী করা যায়?'

'সামলানোর দরকার কী?'

'দরকার আছে। তোর প্রস্তাব আমি গ্রহণ করেছি। ভিখিরি হয়ে যাব। সাত দিনের ক্র্যাশ প্রোগ্রাম। সাত দিন ভিখিরি হয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরব। ভিক্ষা করব।'

'সাত দিনে কিছু হবে না।'

'কত দিন লাগবে?'

'দু' বছর।'

'বলিস কী!'

'ঠিকমতো ওদের জানতে হলে ওদের একজন হতে হবে। ওদের একজন হতে সময় লাগবে।'

'নীতুকে সামলাবো কী করে?'

'যারা ছোটখাট ঘটনাতে আপসেট হয় তারা বড় ঘটনায় সাধারণত আপসেট হয় না। নীতু সামলে উঠবে। আরো বেশি-বেশি করে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাবে। তুই ঘর ছাড়ছিস কবে?'

ইয়াদ বিরক্ত গলায় বলল, আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন? এটা তো তোর উপর নির্ভর করছে। আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত। তুই বললেই শুরু করব — তুই একটা ডেট বল্। আমি নীতুকে বলি।

'আমি ডেট বলব কেন?'

'তুইও তো যাবি আমার সঙ্গে। আমি একা-একা পথে-পথে ভিক্ষা করব?'

'হ্যাঁ, করবি। তোরই ভিক্ষুকদের জীবনচর্চা দরকার। আমার না।'

'তুই আমার সঙ্গে যাচ্ছিস না?'

'না।'

'ও মাই গড! আমি তো ধরেই রেখেছি তুই যাচ্ছিস। সেইভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছি।'

সকালবেলা খালিপেটে আমি সিগারেট খেতে পারি না। শুধুমাত্র বিরক্তিতে

আমি সিগারেট ধরালাম। বিরক্তি ভাব গলার স্বরে যথাসম্ভব ফুটিয়ে তুলে বললাম — তুই ভিক্ষা করতে যাবি, সেখানেও একজন ম্যানেজার নিয়ে যেতে চাস? তুই ভিক্ষা করবি। তোর ম্যানেজার টাকাপয়সার হিসাব রাখবে। খাওয়াদাওয়া দেখবে। ইট বিছিয়ে আগুন করে পানি ফোটাবে যাতে তুই ফুটন্ত পানি খেতে পারিস। যা ব্যাটা গাধা!

ইয়াদ আহত গলায় বলল, গাধা বলছিস কেন?

'যে যা তাকে তাই বলতে হয়। তুই গাধা, তোকে আমি হাতি বলব? যা বলছি, বিদেয় হ।'

'চলে যেতে বলছিস?'

'হ্যাঁ, চলে যেতে বলছি — আর আসিস না।'

'আর আসব না?'

'না। তোকে দেখলেই বিরক্তি লাগে।'

'বিরক্তি লাগে কেন?'

'বেকুবদের সঙ্গে কথা বললে বিরক্তি লাগবে না?'

'গাধা বলছিস ভাল কথা, বেকুব বলছিস কেন?'

'বাথরুমে ঢুকে পড়েছিস-এই জন্যে বেকুব বলছি।'

ইয়াদ বলল, ভুল করে বাথরুমে ঢুকে পড়েছি, খেয়াল করিনি। যাই।

আমি ওর দিকে না তাকিয়ে বললাম, আচ্ছা যা, আর আসিস না।

ইয়াদ বের হয়ে গেল। আমার মনে হল এতটা কঠিন না হলেও বোধহয় হত। তবে আমার কাছ থেকে এ ধরনের ব্যবহার পেয়ে সে অভ্যস্ত। তার খুব খারাপ লাগবে না। লাগলেও সামলে উঠবে। ইয়াদকে আমার পছন্দ হয়। শুধু পছন্দ না, বেশ পছন্দ। রূঢ় ব্যবহার করতে হয় পছন্দের মানুষদের সঙ্গে। আমার বাবার উপদেশনামার একটি উপদেশ হল —

> *হে মানবসন্তান, তুমি তোমার ভালবাসা লুকাইয়া রাখিও। তোমার পছন্দের মানুষদের সহিত তুমি রূঢ় আচরণ করিও, যেন সে তোমার স্বরূপ কখনো বুঝিতে না পারে। মধুর আচরণ করিবে দুর্জনের সঙ্গে। নিজেকে অপ্রকাশ্য রাখার ইহাই প্রথম পাঠ।*

আমাদের মেসে সকালবেলা চা হয় না। চা খেতে রাস্তার ওপাশে ক্যান্টিনে যেতে

হয়। সেই ক্যান্টিনে পৃথিবীর সবচে' মিষ্টি এবং একই সঙ্গে পৃথিবীর সবচে' গরম চা পাওয়া যায়। এই চা প্রথম দু' দিন খেতে খারাপ লাগে। কিন্তু তৃতীয় দিন থেকে নেশা ধরে যায়। ঘুম থেকে উঠেই কয়েক কাপ চা খেতে ইচ্ছা করে।

ক্যান্টিনে পা দেয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেখলাম ইয়াদ আবার আসছে। সে আমাকে দেখতে পেয়েছে। হয়তো আশা করছে আমি হাত ইশারা করে তাকে ডাকব। আমি কিছুই করলাম না। মুখ কঠিন করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম।

ইয়াদ সামনের চেয়ারে বসতে-বসতে বলল, তুই কাল রাতে আমাদের বাড়িতে একটা চিঠি ফেলে এসেছিলি। নিয়ে এসেছিলাম, দিতে ভুলে গেছি। আমি ইয়াদের হাত থেকে চিঠি নিয়ে পকেটে রেখে দিলাম।

ইয়াদ বলল, পড়বি না?

'একসময় পড়ব। তাড়া নেই।'

'নীতু বলে দিয়েছে এটা নাকি জরুরি চিঠি।'

'ও পড়েছে বুঝি?'

ইয়াদ অপ্রস্তুত গলায় বলল, মনে হয় পড়েছে। ওর খুব সন্দেহবাতিক। হাতের কাছে খাম পেলে খুলে পড়ে ফেলে। খামে যার নামই থাকুক সে পড়বেই। সরি।

'তোর সরি হবার কিছু নেই। চা খাবি?'

'খাব।'

আমি ইয়াদকে চা দিতে বলে উঠে দাঁড়ালাম। সে বিস্মিত হয়ে বলল, যাচ্ছিস কোথায়?

'কাজ আছে।'

'চা-টা শেষ করি — তারপর যা।'

'সময় নেই — খুব তাড়া।'

আমি ইয়াদকে রেখে মেসে ফিরে এলাম। দরজা বন্ধ করে লেপের ভেতর ঢুকে পড়লাম। আজ আমার কোনো প্ল্যান নেই — সারাদিন ঘুমাব। ঘুম এবং উপবাস। সন্ধ্যায় উপবাস ভঙ্গ করব এবং বিছানা থেকে নামব।

বিশ্রামের সবচে' ভাল টেকনিক হল —কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে পড়া। মায়ের পেটে আমরা যে-ভঙ্গিতে থাকি — সেই ভঙ্গিটি নিয়ে আসা। মায়ের পেটে গাঢ় অন্ধকার — কাজেই যেখানে বিশ্রাম নিতে হবে, সে-জায়গাটাও হতে হবে অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। তাপ হতে হবে সামান্য বেশি। কারণ জরায়ুর তাপ শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে তিন ডিগ্রী বেশি।

আমার ঘর এম্নিতেই অন্ধকার। কম্বলে নাক-মুখ ঢেকে অন্ধকার আরও বাড়ানো হল। আমি কুণ্ডলী পাকিয়ে শোয়ামাত্র দরজার কড়া নড়ল। আমাদের মেসের মালিক এবং ম্যানেজার জীবনবাবু মিহি গলায় ডাকলেন — হিমু ভাই, হিমু ভাই।

জীবনবাবুর ডাকে সাড়া দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, তিনি আমার কাছে মেসভাড়া পান না। মাসের শুরুতেই ভাড়া দেয়া হয়েছে। ইচ্ছা করলেই চুপচাপ শুয়ে থাকা যায়, তবে তা করা সম্ভব না। কারণ জীবনবাবুর ধৈর্য রবার্ট ব্রুসের চেয়েও বেশি। তিনি ডাকতেই থাকবেন। কড়া নাড়তেই থাকেবেন। সিল্কের মতো মোলায়েম গলায় ডাকবেন। চুড়ির শব্দের মতো শব্দে কড়া নাড়বেন।

'হিমু ভাই, হিমু ভাই।'

'কি ব্যাপার?'

'ঘুমুচ্ছেন?'

'যদি বলি ঘুমুচ্ছি তাহলে কি বিশ্বাস করবেন?'

'একটু আসুন, বিরাট বিপদে পড়েছি।'

দরজা খুলতে হল। জীবনবাবু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন, মাথায় বাড়ি পড়েছে হিমু ভাই। অকূল সমুদ্রে পড়েছি।

'বলুন কি ব্যাপার?'

জীবনবাবু গলার স্বর আরো নামিয়ে ফেললেন। কোনো সাধারণ কথাই তিনি ফিসফিস না করে বলতে পারেন না। বিশেষ কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে, কারণ আমি তাঁর কোনো কথাই প্রায় শুনতে পারছি না।

'আরেকটু জোরে বলুন জীবনবাবু। কিছু শুনতে পাচ্ছি না।'

'প্রতি বৃহস্পতিবার মেসের ছয় নম্বর ঘরে তাসখেলা হয় জানেন তো?'

'জানি।'

'গত রাতে তাসখেলা নিয়ে মারামারি। মুর্শিদ সাহেব মশারির ডাণ্ডা খুলে জহির সাহেবের মাথায় বাড়ি মেরেছে। রক্তারক্তি কাণ্ড!'

'আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, জহির সাহেব কি মারা গেছেন?'

'মারা যায় নাই — তবে বেকায়দার বাড়ি পড়লে উপায় ছিল? খুনখারাবি হলে পুলিশ আগে কাকে ধরত? আমাকে। আমি হলাম মাইনোরিটি দলের লোক। হিন্দু। সব চাপ যায় মাইনোরিটির উপর। আপনারা মেজরিটি হয়ে বেঁচে গেছেন।'

'এইটাই আপনার বিশেষ কথা?'

'জ্বি।'

'আমাকে কিছু করতে বলছেন? তাস ওদেরকে কি না-খেলতে বলব?'

'না না, আপনার কিছু বলার দরকার নেই। ঘটনাটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম। খুনখারাবি যদি সত্যি কিছু হয় — তা হলে পুলিশের কাছে — আমার হয়ে দু'-একটা কথা বলবেন।'

'আচ্ছা বলব। এখন তাহলে যান। আজ সারা দিন ঘুমাব বলে প্ল্যান করেছি। আজ হল আমার ঘুম-দিবস।'

জীবনবাবু নড়লেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি বললাম, আরো কিছু বলবেন?

'জ্বি, বলব। মনে পড়ছে না। মনে করার চেষ্টা করছি।'

'তেমন জরুরি কিছু নয়। জরুরি হলে মনে পড়ত।'

'মনে পড়েছে — একজন মহিলা এসেছিলেন আপনার কাছে।'

'রূপা?'

'জ্বি-না — উনি না। উনাকে তো চিনি। যিনি এসেছিলেন তাঁকে আগে কখনো দেখিনি — নাম বলেছিলেন। নামটা মনে পড়ছে না। স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি গেছে। মাইনোরিটির লোক তো — সারাক্ষণ টেনশানে থেকে থেকে ব্রেইন গেছে।'

'মেয়েটা কিছু বলে গেছে?'

'মেয়ে না তো, পুরুষমানুষ। আমাকে নাম বললেন, একবার না, কয়েকবার বললেন।'

'আপনি দয়া করে বিদেয় হন।'

'নামটা মনে করার চেষ্টা করছি। মনে পড়ছে না। বললাম না আপনাকে — ব্রেইন একেবারে গেছে। কিছুই মনে থাকে না। ঐদিন দুপুরে ভাত খেতে গেছি — অতসী বলল — বাবা, তুমি না একটু আগে ভাত খেয়ে গেলে! বুঝুন অবস্থা! এদিকে ব্লাডপ্রেশারও নেমে গেছে। ব্লাডপ্রেশার হয়েছে সিক্সটি। সিক্সটি ব্লাডপ্রেশার মানুষের হয় না। গরু-ছাগলের হয়। গরু-ছাগলের পর্যায়ে চলে গেছি হিমু ভাই . . . '

জীবনবাবুকে বিদেয় করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আশঙ্কা নিয়ে শুয়ে আছি। যে-কোনো মুহূর্তে ভদ্রলোকের নাম জীবনবাবুর মনে পড়বে। তিনি দরজায় ধাক্কা দিতে-দিতে ডাকবেন — হিমু ভাই, হিমু ভাই।

ঘুম আনার চেষ্টা করছি। লাভ হচ্ছে না। কোনোভাবেই শুয়ে আরাম পাচ্ছি না। বুকপকেটে রাখা রূপার খামটা খচখচ করছে। তার চিঠিটা পড়ে ফেলা দরকার।

চিঠি পড়ার মুহূর্ত আসছে না। প্রিয় চিঠি পড়ার জন্যে প্রয়োজন প্রিয় মুহূর্তের। আমার প্রিয় মুহূর্ত হল মধ্যরাত, যখন পৃথিবীর সব তক্ষক গম্ভীর স্বরে দু' বার ডেকে ওঠে।

দরজায় আবার ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। জীবনবাবু ডাকলেন — হিমু ভাই, হিমু ভাই।

আমি জবাব না দিয়ে রূপার চিঠি বের করলাম।

'হিমু ভাই।'

'বলুন। কথা কি মনে পড়েছে?'

'জ্বি–না, মনে পড়েনি। অন্য একটা কথা বলতে এসেছি। বলব?'

'বলুন।'

'তাসখেলা নিয়ে উনাদের কিছু বলবেন না। রাগ করতে পারেন।'

'আচ্ছা বলব না। আর শুনুন জীবনবাবু, এখন একটা জরুরি কাজ করছি — চিঠি পড়ছি। আমাকে বিরক্ত করবেন না। ঐ লোকের নাম মনে পড়লে — কাগজে লিখে ফেলবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

ঘরে চিঠি পড়ার মত আলো নেই — আধো আলো আধো আঁধারে আমি চিঠি পড়ছি —

ভেবেছিলাম তোমার জন্মদিনে উদ্ভট কিছু করে তোমাকে চমকে দেব। কি করা যায় অনেক ভাবলাম। দামী গিফ্‌টের কথা একবার মনে হয়েছিল। গিফ্‌টের ব্যাপারে তোমার আসক্তি নেই — মাঝখান থেকে টাকা নষ্ট হবে । তারপর ভাবলাম সব ক'টি দৈনিক পত্রিকায় একপাতার বিজ্ঞাপন দিই — বিজ্ঞাপনে লেখা থাকবে — শুভ জন্মদিন হিমু! বাবার ম্যানেজার সাহেবকে ডেকে এনে বললাম পরিকল্পনার কথা। শুনে তাঁর চোয়াল ঝুলে পড়ল। তিনি হাঁ করে তাকিয়ে আছেন তো তাকিয়েই আছেন। আমি বললাম — পরিকল্পনাটা আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না?

তিনি বললেন, হচ্ছে।

আমি বললাম, তাহলে খোঁজ নিয়ে বলুন কত লাগবে। আমি চেক লিখে দিচ্ছি।

তিনি বললেন, হিমু লোকটা কে?

'আমার চেনা একজন। পাগলা ধরনের মানুষ।'

তিনি মাথা চুলকে বললেন, পাগলা ধরনের একজন মানুষের জন্মদিনের কথা

যত কম লোক জানে ততই ভাল। দেশসুদ্ধ লোককে জানিয়ে লাভ কি?

ম্যানেজার চাচার কথা আমার মনে ধরল। আসলেই তো, সবাইকে জানিয়ে কী হবে? যার জানার কথা সেই তো জানবে না। তুমি নিজেই তো পত্রিকা পড় না।

ম্যানেজার চাচা বললেন, মা, তুমি সুন্দর দেখে একটা কার্ড কিনে লিখে দাও — হ্যাপি বার্থ ডে। আমি উনাকে দিয়ে আসব। এক শ' টাকার মধ্যে গোলাপের তোড়া পাওয়া যায়, ঐ একটাও না হয় সঙ্গে দিয়ে দেব।

আমি বললাম, আচ্ছা, তাই করব।

ম্যানেজার চাচা চলে গেলেন, যাবার সময় অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন, যেন আমার নিজের মাথার সুস্থতা নিয়েও তাঁর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

হিমু, আমি আসলেই খানিকটা অসুস্থ বোধ করছি। নানান ধরনের ছোটখাটো পাগলামি করছি। ইচ্ছা করে যে করছি তা নয়। সেদিন বাবার সঙ্গে ঝগড়া করলাম। আমার ছোটমামা স্টেটস থেকে মেম-বউ নিয়ে দেশে এসেছেন। সেই মেমসাহেবের সম্মানে পার্টি। সবাই সেজেগুজে তৈরি হয়ে আছে। আমি নিজেও খুব সেজেছি। গয়নাটয়না পরে একটা কাণ্ড করেছি — গাড়িতে ওঠার সময় কী যে হল, আমি বললাম, আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।

বাবা বললেন, তার মানে কি?

আমি বললাম, আমার রিসিপশনে যেতে ভাল লাগছে না।

'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

'না, শরীর খারাপ লাগছে না — শুধু যেতে ইচ্ছা করছে না।'

বাবা বললেন, তুমি আমার সঙ্গে ড্রয়িংরুমে আস। আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলব।

সবাই গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। বাবা আমাকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে গেলেন। স্কুলের হেডমাস্টারদের মতো গলায় বললেন, সিট ডাউন ইয়াং লেডি।

আমি বসলাম। বাবা বললেন, তোমার ছোটমামাকে যে পার্টি দেয়া হচ্ছে সেই পার্টি আমরা দিচ্ছি। আমরা হচ্ছি হোস্ট। কাজেই আমাদের উপস্থিত থাকতেই হবে। তোমার শরীর খারাপ থাকলে তোমাকে কিছু বলতাম না। তোমার শরীর ভাল আছে। তোমার যেতে ইচ্ছা করছে না, সেটা বুঝতে পারছি। অনেক সময় আমাদের অনেককিছু করতে ইচ্ছা করে না। তবু আমরা করি। মানুষ হয়ে জন্মালে সামাজিক রীতিনীতি মানতে হয়। এখন চল আমার সঙ্গে — সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, না।

বাবা খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝতে পারছি ভেতরে-ভেতরে রাগে তিনি কাঁপছেন। তার পরেও রাগ সামলে নিয়ে বললেন, রূপা, তুমি না হয় খানিকক্ষণ থেকে চলে এসো।

আমি আবারো বললাম, না। বাবা আর কিছু বললেন না। আমাকে রেখে চলে গেলেন। খালি বাসায় আমি একা। তখন আবার মনে হল — কেন যে থাকলাম, চলে গেলেই হত!

হিমু, আমি এরকম হয়ে যাচ্ছি কেন বল তো? ইদানীং বিকট-বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখছি। শুধু যে বিকট তাই না — নোংরা সব স্বপ্ন। এত নোংরা যে ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। কি দেখি জান? দেখি লম্বা রোগা বিকলাঙ্গ একজন মানুষ আমার সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছে। কুষ্ঠ-রোগীর হাতের মতো হাত। তার হাত থেকে পুঁজ, রক্ত আমার সারা গায়ে লেগে যাচ্ছে। চিৎকার করে জেগে উঠি। সারা গা ঘিনঘিন করতে থাকে। আমি বাথরুমে ঢুকে সাবান দিয়ে গা ধুই। হিমু, আমার কি হচ্ছে বল তো? আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিনা কে জানে। তোমার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। দেখা হলে বলতাম, আমার হাতটা একটু দেখে দাও তো!

কোথায় জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাব তা না, আজেবাজে সব কথা বলে সময় নষ্ট করছি। জন্মদিনের শুভেচ্ছা নাও। আমি কথার কথা হিসেবে শুভেচ্ছা বলছি না। আমি মনেপ্রাণে কামনা করছি। তোমার দিন সুন্দর হোক।

রাতে দরজা-জানালা বন্ধ করে আমি অনেকক্ষণ তোমার জন্যে প্রার্থনা করেছি, যেন তুমি সুখে থাক। মধ্যবিত্তের সহজ সুখ নয় — অসাধারণ সুখ — খুব অল্প মানুষই যে-সুখের সন্ধান পায়।

তোমার সঙ্গে অনেকদিন আমার দেখা হয় না। এবার দেখা হলে কী করব জান? এবারে দেখা হলে তোমাকে যশোর নিয়ে আসব। এখানে আমাদের একটা খামারবাড়ি আছে। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। চারদিক গাছ-গাছড়ায় ঢাকা। বাড়ির সামনেই পুকুর। তোমাকে ঐ খামারবাড়িতে নিয়ে যেতে চাই — একটা জিনিস দেখানোর জন্যে — সেটা হচ্ছে — পুকুরের পানি কত পরিষ্কার হতে পারে সেটা স্বচক্ষে দেখা। শীত-বর্ষা, শরৎ-হেমন্ত সব সময় এই পুকুরের পানি কাঁচের মতো ঝকঝক করছে। আমি এই পুকুরের নাম দিয়েছি — 'অশ্রুদিঘি। বল তো কেন?'

আমার জীবনে অসংখ্য বাসনার একটি হচ্ছে কোনো-এক ভরা পূর্ণিমায় তোমার সঙ্গে অশ্রুদিঘিতে সাঁতার কাটব। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি সাঁতার জানি না।

আচ্ছা হিমু, আমার এই চাওয়া কি খুব বড় কিছু চাওয়া? আমি কখনো কারো কাছে কিছু চাই না। ঠিক করেছি এ জীবনে কিছু চাইব না। আলাদীনের চেরাগের দৈত্য যদি হঠাৎ উপস্থিত হয়ে আমাকে বলে — রূপা, চট-চট করে বল। তোমার তিনটা ইচ্ছা আমি পূর্ণ করব। তাহলে মাথা চুলকে আমি বলব, স্যার থ্যাংক য়্যু, আপনার কাছে আমার কিছু চাইবার নেই। আমার যা চাইবার তা চাইতে হবে হিমুর কাছে। ওকে একটু আমার কাছে এনে আপনি বিদেয় হোন। আপনার গা থেকে বিশ্রী গন্ধ আসছে।.....

দরজায় মিহি করে টোকা পড়ছে। জীবনবাবু কয়েক বার কেশে ফিসফিস করে ডাকলেন, হিমু ভাই! হিমু ভাই!

আমি চিঠি পড়া বন্ধ রেখে বললাম, কি হল জীবন বাবু?

'নামটা মনে পড়েছে।'

'বলুন। বলে বিদেয় হোন।'

'এটা ছাড়াও আরো একটা কথা বলতে চাচ্ছি।'

'কাগজে লিখে রাখুন। আমি পরে পড়ব।'

'লিখে রাখতে গিয়েছিলাম — তারপর দেখি বল পয়েন্টে কালি নেই। আপনার কাছে কি বল পয়েন্ট আছে?'

আমি দরজা খুলে বললাম, লিখতে হবে না। মুখে বলুন, শুনে নিচ্ছি।

তরঙ্গিণী স্টোর থেকে মুহিব সাহেব এসেছিলেন।

'কিছু বলেছেন?'

'জ্বি-না, কিছু বলেননি।'

'ও, আচ্ছা।'

'প্রায় সারা দিন বসে ছিলেন। দুপুরে কিছু খানওনি। এক কাপ চা আনিয়ে দিয়েছিলাম — সেটাও খাননি।'

'চা না খাওয়ারই কথা। মুহিব সাহেব চা পান সিগারেট কিছুই খান না। কি জন্যে এসেছিলেন কিছু বলেননি?'

'জ্বি-না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন তা হলে যান।'

'অন্য আরেকটা কথা হিমু ভাই। গোপন কথা।'

'বলুন কি বলবেন?'

জীবনবাবু বসলেন। মাথা নিচু করে বসলেন। অসহায় বসার ভঙ্গি।

'খুব বিপদে পড়েছি হিমু ভাই। ভয়ংকর বিপদ।'

'বলুন।'

'আজ থাক, অন্য একদিন বলব।'

'আপনার মেয়ে ভাল আছে তো?'

'জ্বি জ্বি। মেয়ে ভাল আছে। ওর কোনো সমস্যা না। মেয়েটার বিয়েও মোটামুটি ঠিকঠাক। সিরাজগঞ্জের ছেলে। কাপড়ের ব্যবসা আছে। অতসীকে দেখে পছন্দ করেছে। তিন লাখ টাকা পণ চাচ্ছে। দেব তিন লাখ টাকা। মেসবাড়িটা বেচে দেব। একটাই তো মেয়ে। আমিও একা মানুষ — মেয়ে বিয়ে দিয়ে বাকি জীবনটা হোটেলে কাটিয়ে দেব। বুদ্ধিটা ভাল না হিমু ভাই ?'

'হ্যাঁ, ভাল।'

'আমি আজ উঠি, অন্য আরেকদিন এসে আমার বিপদের কথাটা বলব।'

'আমাকে বললে আপনার বিপদ কি কমবে? যদি মনে করেন বিপদ কমবে, তা হলে বলুন। আর যদি বিপদ না কমে, শুধুশুধু কেন বলবেন?

রূপার চিঠির শেষটা আমার পড়া হল না। চিঠি ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলাম — আজ থাক্। অন্য কোনো সময় পড়া যাবে।

৪

বড় রাস্তার ফুটপাতে উবু হয়ে বসে বয়স্ক এক ভদ্রলোক ঠোঙা থেকে বাদাম নিয়ে নিয়ে খাচ্ছেন। খাওয়ার ব্যাপারটায় বেশ আয়োজন আছে। খোসা থেকে বাদাম ছড়ানো হয়। খোসাগুলি রাখা হয় সামনে। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ বাদামে ফুঁ দিতে থাকেন। ফুঁয়ের কারণে বাদামের গায়ে লেগে থাকা লাল খোসা উড়ে যায়। তখন তিনি অনেক উপর থেকে একটা একটা করে বাদাম তাঁর মুখে ফেলেন। আমি কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার মতো আরো কয়েকজন কৌতূহলী হয়েছে। তারাও দেখি দূর থেকে তাকিয়ে আছে।

ভদ্রলোক শেষ বাদামের টুকরো মুখে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বললেন, ছোটমামা না?

আজ তিনিই প্রথম আমাকে চিনলেন। আমি চিনতে পারিনি। এখন চিনলাম — মোরশেদ সাহেব। ঐদিন স্যুট-টাই পরা ছিলেন. আজ পায়জামা পাঞ্জাবি চাদর। ভদ্রলোককে পায়জামা-পাঞ্জাবিতে আরো সুন্দর লাগছে।

'কি করছিলেন মোরশেদ সাহেব?'

'বাদাম খাচ্ছিলাম। অনেক দিন বাদাম খাই না। একটা ছেলে গরম-গরম বাদাম ভাজছিল। দেখে লোভ লাগল। দু' টাকার কিনলাম। অনেকে হাঁটতে-হাঁটতে বাদাম খেতে পারে। আমি পারি না। ফুটপাতে বসে বাদাম খাচ্ছিলাম। লোকজন এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন যেন আমি একটা পাগল।'

'আপনি ভাল আছেন?'

'জ্বি ছোটমামা, ভাল।'

'এষা, এষা কেমন আছে?'

'মনে হয় ভালই আছে। আর খারাপ থাকলেও তো আমাকে বলবে না।'

'আপনি কি এর মধ্যে গিয়েছিলেন ওর কাছে?'

'আমি তো দু'-তিন দিন পরপর যাই। ও খুব বিরক্ত হয়। তার পরেও যাই।'

'যান ভাল করেন। নিজের স্ত্রীর কাছে যাবেন না তো কার কাছে যাবেন?'

মোরশেদ সাহেব বিষণ্ন গলায় বললেন, এষাকে এখনও স্ত্রী বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। ও উকিলের নোটিশ পাঠিয়েছে। ডিভোর্স চায়।

'নোটিশ কবে পাঠিয়েছে?'

'কবে পাঠিয়েছে সেই তারিখ দেখিনি। আমি পেয়েছি আজ। মন খুব খারাপ হয়েছে। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না ছোটমামা, নোটিশ পাওয়ার পর আমার চোখে পানি এসে গেল। সকালে যখন নাশতা খাচ্ছি তখন নোটিশটা এসেছে। তারপর আর নাশতা খেতে পারি না। পরোটা ছিঁড়ে মুখে দিয়েছি। চাবাচ্ছি তো চাবাচ্ছিই, গলা দিয়ে আর নামছে না। এক ঢোক পানি খেলাম, যদি পানির সঙ্গে পরোটা নেমে যায়। পানি পেটে চলে গেল কিন্তু পরোটা মুখে রইল।'

'আসুন মোরশেদ সাহেব, কোথাও গিয়ে বসি। আপনাকে ক্লান্ত লাগছে। সারা দিনই বোধহয় হাঁটাহাঁটি করছেন?'

'জ্বি। দুপুরেও কিছু খাইনি। এমন খিদে লেগেছে। তারপর বাদাম কিনে ফেললাম দু' টাকার। কিনতাম না, ছেলেটা গরম-গরম বাদাম ভাজছিল। দেখে খুব লোভ লাগল।'

আমি ভদ্রলোককে নিয়ে গেলাম সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। সময় কাটানোর জন্যে খুব ভাল জায়গা। জোড়ায়-জোড়ায় ছেলেমেয়ে গল্প করে। দেখতে ভাল লাগে। এরা যখন গল্প করে তখন মনে হয় পৃথিবীতে এরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। কোনদিন থাকবেও না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-বর্ষা কোনোকিছুই এদের স্পর্শ করে না। একবার ঘোর বর্ষায় দু'জনকে দেখেছি ভিজে-ভিজে গল্প করছে। মেয়েটি কাজল পরে এসেছিল। পানিতে সেই কাজল ধুয়ে তাকে ডাইনীর মত লাগছিল। সেই ভয়ংকর দৃশ্যও ছেলেটির চোখে পড়ছে না। সে তাকিয়ে আছে মুগ্ধ চোখে।

'মোরশেদ সাহেব।'

'জ্বি?'

'কিছু খাবেন? এখানে ভ্রাম্যমাণ হোটেল আছে, চা, কোল্ড ড্রিংস এমনকি বিরিয়ানীর প্যাকেট পর্যন্ত পাওয়া যায়।'

'আমি কিছু খাব না। আচ্ছা ছোটমামা, আপনি আমাকে মোরশেদ সাহেব ডাকেন কেন? আপনি আমার নাম ধরে ডাকবেন। আপনি হচ্ছেন এষার মামা।'

'আচ্ছা তাই ডাকব। এখন বলুন তো দেখি — এষা আপনাকে ডিভোর্স দিতে চাচ্ছে কেন?'

'আমি তো মামা অসুস্থ। খারাপ ধরনের এপিলেপ্সি। ডাক্তাররা বলেন গ্রান্ডমোল। একেকবার যখন অ্যাটাক হয় ভয়ংকর অবস্থা হয়। অসুখের জন্য চাকরি টাকরি সব চলে গেছে।'

'অ্যাটাক কি খুব ঘন-ঘন হয়?'

'আগে হত না। এখন হচ্ছে।'

'চিকিৎসা করাচ্ছেন না?'

'চিকিৎসা তো মামা নেই। ডাক্তাররা কড়া ঘুমের অষুধ দেন। এগুলি খেয়ে-খেয়ে মাথা কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাসার সামনে কোনো আমগাছ নেই। কিন্তু যখনই আমি বাইরে থেকে বাসায় যাই তখনি আমি দেখি বিশাল এক আমগাছ।'

'চোখে দেখেন?'

'জ্বি, দেখি। শুধু গাছটা দেখি তাই না, গাছে পাখি বসে থাকে, সেগুলি দেখি। ওরা কিচিরমিচির করে, সেই শব্দ শুনতে পাই'

'বলেন কী!'

মোরশেদ সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু যেতে ইচ্ছা করে না। তার উপর শুনেছি ওরা অনেক টাকা নেয়। জমানো টাকা খরচ করে করে চলছি তো মামা। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

'আমার চেনা একজন সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন। আমি একদিন তাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যাব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'চলুন, আপনাকে বাসায় দিয়ে আসি।'

'আমি এখন বাসায় যাব না মামা। উকিল নোটিশটা টেবিলে ফেলে এসেছি। বাসায় গেলেই নোটিশটা চোখে পড়বে। মনটা হবে খারাপ। এখানে বসে থাকতেই ভাল লাগছে।'

'বেশ, তা হলে বসে থাকুন।'

মোরশেদ সাহেব ইতস্তত করে বললেন, মামা, আপনি কি একটু এষার সঙ্গে কথা বলে দেখবেন? কোনো লাভ হবে না জানি, তবু যদি একটু . . . '

'আমি বলব।'

'আমার একটা ক্যামেরা আছে। ক্যামেরাটা বিক্রি করে দেব বলে ঠিক করেছি। হাত একেবারে খালি হয়ে এসেছে। দেখবেন তো কাউকে পাওয়া যায় কিনা। বিয়ের

সময় কিনেছিলাম। এষার খুব ছবি তোলার শখ ছিল। ওর জন্যেই কেনা।'

'আচ্ছা দেখব, ক্যামেরা বিক্রি করা যায় কিনা।'

'থ্যাংকস মামা।' আপনি সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোকের সঙ্গেও একটু কথা বলবেন। কত টাকা নেন, এইসব।'

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে এলাম। মোরশেদ সাহেব পা তুলে সন্ন্যাসীর ভঙ্গিতে বসে আছেন। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখতে ভাল লাগছে।

নীতু একজন সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছিল। কার্ডটা হারিয়ে ফেলেছি। নীতুর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে একবার ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে আসতে হবে।

৫

নীতুর সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোকের নাম ইরতাজুল করিম। নামের শেষে এ বি সি ডি অনেক অক্ষর। এতগুলি অক্ষর যিনি জোগাড় করেছেন তাঁর অনেক বয়স হবার কথা, কিন্তু ভদ্রলোক মধ্যবয়স্ক এবং হাসিখুশি। মুখে জর্দা দেয়া পান। বিদেশি ডিগ্রীধারী ভদ্রলোকরা জর্দা দেয়া পান খান না। আর খেলেও বাড়িতে চুপিচুপি খান। কেউ এলে দাঁত মেজে বের হন। এই ভদ্রলোক দেখি বেশ আয়েশ করে পান খাচ্ছেন। এবং পিক করে অ্যাশট্রেতে পানের পিক ফেলছেন। তাঁর চেম্বারটাও সুন্দর। অফিস-অফিস লাগে না, মনে হয় ড্রয়িংরুম। ডাক্তার সাহেবের ঠিক মাথার উপর ক্লুঁদ মনের আঁকা water lily-র বিখ্যাত পেইনটিং-এর প্রিন্ট। প্রিন্ট দেখতেই এত সুন্দর, আসলটা না জানি কত সুন্দর! আমি ডাক্তার সাহেবের সামনের চেয়ারটায় বসলাম। ভদ্রলোক আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, কেমন আছেন হিমু সাহেব?

'জ্বি ভাল।'

'ইয়াদ সাহেবের স্ত্রী মিসেস নীতু অনেক দিন আগেই আপনার ব্যাপারে আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। তাও একবার না, দু'বার। তাদের মতো ফ্যামিলি থেকে যখন দু'বার টেলিফোন আসে তখন চিন্তিত হতে হয়। আমি চিন্তিত হয়েই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। আরাম করে বসুন তো।'

আমি নড়েচড়ে বসলাম। ডাক্তার সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, আসতে এত দেরি করেছেন কেন?

'টাকাপয়সা ছিল না, তাই দেরি করেছি। আপনি কত টাকা নেন তা তো জানি না।'

'আমি অনেক টাকা নিই। তবে টাকা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনার চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার মিসেস নীতু নিয়েছেন।'

'আমি তাহলে অসুস্থ?'

'উনার তাই ধারণা।'

'আপনার কী ধারণা ডাক্তার সাহেব?'

'আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা না বলে ধরতে পারব না।'

'কথাবার্তা বললেই ধরতে পারবেন?'

'হ্যাঁ পারব। পারা উচিত। অবশ্যি আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনাকে সত্যি কথা বলতে হবে। আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। অধিকাংশ লোক তাই করে — সাইকিয়াট্রিস্টদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।'

'বিভ্রান্ত করার চেষ্টা থেকেই তো আপনার ধরতে পারার কথা — লোকটি কী চায়? তার সমস্যা কি?'

'ধরতে চেষ্টা করি। সব সময় পারি না। মানুষের ব্রেইন নিয়ে আমাদের কাজকর্ম — সেই ব্রেইন কেমন জটিল তা কি আপনি জানেন হিমু সাহেব?'

'জানি না, তবে আঁচ করতে পারি।'

'না, আপনি আঁচও করতে পারেন না। মানুষের ব্রেইনে আছে এক বিলিয়ন নিউরোন। এক-একটি নিউরোনের কর্মপদ্ধতি বর্তমান আধুনিক কম্পুটারের চেয়ে জটিল। বুঝতে পারছেন কিছু?'

'না।'

'বুঝতে পারার কথাও না। এখন আমরা কথা বলা শুরু করি। আপনি বেশ রিলাক্সড ভঙ্গিতে নিজের কথা বলুন তো শুনি। যা মনে আসে বলতে থাকুন। নিজের কথা বলুন, নিজের বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনের কথা বলুন, বন্ধুবান্ধবের কথা বলুন। চা খেতে-খেতে, সিগারেট খেতে-খেতে বলুন।'

'আমাকে কি কৌচে শুয়ে নিতে হবে না?'

'না, ঐসব ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি বাতিল হয়ে গেছে। আপনি শুরু করুন।'

'আপনার কি তাড়া আছে ডাক্তার সাহেব?'

'না, আমার কোনো তাড়া নেই। অন্যসব রোগী বিদায় করে দিয়েছি। আপনি হচ্ছেন — বিশেষ এক রোগী, ভেরি স্পেশাল। চা দিতে বলি, নাকি কফি খাবেন?'

'চা কফি কিছুই লাগবে না। যা শুনতে চাচ্ছেন বলছি। দু'ভাবে বলতে পারি — সাধারণভাবে কিংবা ইন্টারেস্টিং করে। কীভাবে শুনতে চান?'

'সাধারণভাবেই বলুন। ইন্টারেস্টিং করার প্রয়োজন দেখছি না। আমার ধারণা এমনিতেই ইন্টারেস্টিং হবে।'

'আমি কি পা উঠিয়ে বসতে পারি?'

'পারেন।'

আমি জীবন-ইতিহাস শুরু করলাম।

'ডাক্তার সাহেব, আমার বাবা ছিলেন একজন অসুস্থ মানুষ। সাইকোপ্যাথ।

এবং আমার ধারণা খুব খারাপ ধরনের সাইকোপ্যাথ। তাঁর মাথায় কি করে যেন ঢুকে গেল — মহাপুরুষ তৈরি করা যায়। যথাযথ ট্রেনিং দিয়েই তা করা সম্ভব। তাঁর যুক্তি হচ্ছে — ডাক্তার, ইনজিনীয়ার, ডাকাত, খুনী যদি শিক্ষা এবং ট্রেনিং-এ তৈরি করা যায়, তা হলে মহাপুরুষ কেন তৈরি করা যাবে না? অসুস্থ মানুষদের চিন্তা হয় সিঙ্গেল ট্র্যাকে। তাঁর চিন্তা সেইরকম হল — তিনি মহাপুরুষ তৈরির খেলায় নামলেন। আমি হলাম তাঁর একমাত্র ছাত্র। তিনি এগুলেন খুব ঠাণ্ডা মাথায়। তাঁর ধারণা হল, আমার মা বেঁচে থাকলে তিনি তাঁকে এ-জাতীয় ট্রেনিং দিতে দেবেন না। কাজেই তিনি মা'কে সরিয়ে দিলেন।'

'সরিয়ে দিলেন মানে?'

'মেরে ফেললেন।'

'কী বলছেন এসব!'

'আমি অবশ্যি মা'কে খুন হতে দেখিনি। তেমন কোনো প্রমাণও পাইনি। বাবা প্রমাণ রেখে খুন করবেন এমন মানুষই না। খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক। তাঁর মাথা এত ঠাণ্ডা যে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় হয়তো তিনি অসুস্থ ছিলেন না। অসুস্থ মানুষ এত ভেবেচিন্তে কাজ করে না। অসুস্থ মানুষের মাথা এত পরিষ্কার থাকে না।'

'তারপর বলুন।'

'আপনার কাছে কি ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে?'

'অবশ্যই ইনটারেস্টিং, তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।'

আমি হেসে ফেললাম।

ডাক্তার সাহেব বললেন, হাসছেন কেন?

আমি বললাম, গল্প বলে আমি আপনাকে বিভ্রান্ত করব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যা বলছি সবই সত্যি। আপনাকে গল্প ছাড়াই আমি বিভ্রান্ত করতে পারি।

'করুন তো দেখি!'

আমি হাসিমুখে কিছুক্ষণ ডাক্তার সাহেবের দিকে তাকিয়ে সহজ গলায় বললাম, আপনার বাড়িতে এই মুহূর্তে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আপনার ছোট মেয়ে কিছুক্ষণ আগে তার পায়ে কিংবা হাতে ফুটন্ত পানি ফেলেছে। তাকে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে।

'আপনি আমাকে এই কথা বিশ্বাস করতে বলছেন?'

'জ্বি, বলছি।'

ইরতাজুল করিম সাহেব অ্যাসট্রেতে পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, হিমু সাহেব, আপনি কি চান আমি বাসায় টেলিফোন করি?

'করুন।'

ডাক্তার সাহেব টেলিফোন করতে লাগলেন. লাইন এনগেইজড পাওয়া যাচ্ছে। ডাক্তার সাহেবের চোখ-মুখ শক্ত হতে শুরু করেছে। তিনি রিসিভার নামিয়ে রাখছেন, আবার ডায়াল করছেন। আমি সিগারেট ধরিয়ে আগ্রহ নিয়ে ডাক্তার সাহেবকে দেখছি। ডায়াল করতে করতে তিনি আমার দিকে সরু চোখে তাকাচ্ছেন।

লাইন পেতে তাঁর দশ মিনিটের মতো লাগল। এই দশ মিনিটে তিনি ঘেমে গেলেন। কপাল ভর্তি ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম। লাইন পাবার পর তিনি কাঁপা গলায় বললেন, কে, কে?

ওপাশের কথা শুনতে পাচ্ছি না। তবে ডাক্তার সাহেবের কথা থেকে বুঝতে পারছি ওপাশে তাঁর স্ত্রী ধরেছেন।

ডাক্তার সাহেব বললেন, কেমন আছ? সবাই ভাল? শুচি কী করছে? টিভি দেখছে? আমার আসতে দেরি হবে। আচ্ছা রাখি।

তিনি রিসিভার নামিয়ে রেখে রাগী গলায় বললেন, আমার ছোটমেয়ে শুচি ভাল আছে। টিভি দেখছে। আপনি আমাকে ভয় দেখালেন কেন?

'ভয় তো দেখাইনি! বিভ্রান্ত করেছি। আপনার মতো অতি আধুনিক একজন মানুষ আমার কথা বিশ্বাস করে আতঙ্কে অস্থির হয়ে গেলেন। কাজেই দেখুন — বিভ্রান্ত করতে চাইলে আমি করতে পারি। আমি কি আমার জীবনবৃত্তান্ত বলব, না আপনি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন?'

'বলুন। সংক্ষেপে বলুন। ডিটেইলসে যেতে হবে না।'

'সংক্ষেপেই বলছি — বাবা আমাকে মহাপুরুষ বানানোর কাজে লেগে গেলেন। আমাকে সংসার, চারপাশের জীবন, অপরূপ প্রকৃতি প্রসঙ্গে নিরাসক্ত করতে চাইলেন।'

'কীভাবে?'

'বুদ্ধি খাটিয়ে আসক্তি কাটানোর তিনি নানা পদ্ধতি বের করেছিলেন। সংক্ষেপে বলতে বলছেন বলেই পদ্ধতিগুলি আর বর্ণনা করছি না।'

'একটি পদ্ধতি বলুন।'

'একবার বাবা আমার জন্যে একটা তোতা পাখি আনলেন। আমার বয়স তখন চার কিংবা পাঁচ। আমি পাখি দেখে মুগ্ধ। বাবা বললেন, তোতা খুব সহজে কথা

শিখতে পারে। তুই ওকে কথা শেখা। রোজ এর কাছে দাঁড়িয়ে বলবি — হিমু, হিমু। একদিন দেখবি সে সুন্দর করে তোকে ডাকবে — হিমু। হি . . . মু . . . .। আমি মহাউৎসাহে পাখিকে কথা শেখাই। একদিন সত্যি-সত্যি সে পরিষ্কার গলায় ডেকে উঠল — হিমু, হিমু। আমি আনন্দে কেঁদে ফেললাম। বাবা তখন পাখিটাকে খাঁচা থেকে বের করে একটানে মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে ফেললেন।'

ডাক্তার সাহেব চাপা গলায় বললেন, মাই গড!

আমি হাসিমুখে বললাম, আপনি চাইলে আরো দু'-একটা পদ্ধতির কথা বলতে পারি। বলব?

'না, থাক। আমি আর শুনতে চাচ্ছি না।'

'মানুষের চরিত্রের ভয়ংকর দিকগুলিও আমি যেন জানতে পারি বাবা সেই ব্যবস্থাও করলেন। কিছু ভয়ংকর ধরনের মানুষের সঙ্গে আমাকে বাস করতে পাঠালেন। তাঁরা সম্পর্কে আমার মামা। পিশাচ-চরিত্রের মানুষ। বলতে পারেন আমি আমার জীবনের একটি অংশ পিশাচদের সঙ্গে কাটিয়েছি। তবে মামারা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যাকে বলে অন্ধ স্নেহ। পাগলদের বিচিত্র মানসিকতা যেন আমি ধরতে পারি সে জন্যে তিনি প্রায়ই বাসায় পাগল ধরে নিয়ে আসতেন -- যত্ন করে দু' দিন-তিন দিন রাখতেন। একজন এসেছিল ভয়াবহ উন্মাদ। সে রান্নাঘর থেকে বটি এনে আমার গায়ে কোপ বসিয়েছিল। পিঠে এখনো দাগ আছে। দেখতে চান?'

'না। আজ বরং থাক। আর শুনতে ভাল লাগছে না। এক সপ্তাহ পর ঠিক এই দিনে আবার কথা বলব। আমি ডাইরিতে লিখে রাখলাম। একটু রাত করে আসুন, দশটার দিকে।'

'চলে যেতে বলছেন?'

'হ্যাঁ, চলে যান। আমার নিজের শরীরও ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে আপনার গল্প আমাকে এফেক্ট করেছে। যাবার আগে শুধু বলে যান — আপনার বাবার এক্সপেরিমেন্ট কি সফল হয়েছে?

আমি উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললাম — সফল হয়নি। বাবার এক্সপেরিমেন্টে ত্রুটি ছিল। তিনি মানুষের অন্ধকার দিকগুলিই আমাকে দেখাতে চেয়েছিলেন। আলোকিত দিক দেখাতে পারেননি। আমার প্রয়োজন ছিল ঈশ্বরের কাছাকাছি একজন মানুষ — যে আমাকে শেখাবে — ভালবাসা, আনন্দ, আবেগ এবং মঙ্গলময় মহাসত্য। আমি নিজে এখন সেইরকম মানুষই খুঁজে বেড়াচ্ছি। পাচ্ছি না। পেলে

বাবার এক্সপেরিমেন্টের ফল দেখতে পারতাম।

'আপনি বিশ্বাস করেন মহাপুরুষ হওয়া সম্ভব?'

'হ্যাঁ, করি। ডাক্তার সাহেব, আর একটা কথা আপনাকে বলা দরকার। আমি কিন্তু মাঝে-মাঝে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। কিছু-একটা বলি, তা লেগে যায়। আপনাকে যখন বললাম আপনার মেয়ে গরম পানিতে পুড়ে গেছে তখন আমি নিজে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম যে তাই ঘটেছে। আপনি হয়ত লক্ষ করেননি যে আমি বলেছি আপনার সবচে' ছোট মেয়ে। আমি জানতাম না আপনার কয়েকটি মেয়ে আছে।'

'কাকতালীয় ব্যাপার, হিমু সাহেব।'

'ঠিক কাকতালীয় নয়। আপনি কি আরেকবার টেলিফোন করে দেখবেন?'

'না। আপনি একবার আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন। আমি দ্বিতীয়বার আমাকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ আপনাকে দেব না। আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান মানুষ, তবে আমাকে বোকা ভাবারও কারণ নেই।

আমি হেসে ফেললাম। ডাক্তার সাহেব বললেন, আপনি কোথায় যাবেন বলুন? আসুন আমার সঙ্গে, আপনাকে নামিয়ে দেব।

'চলুন।'

বেশির ভাগ ডাক্তার নিজের গাড়ি নিজেই চালান। শিক্ষকরা যেমন সবাইকে ছাত্র মনে করেন, ডাক্তাররাও সেরকম সবাইকে রোগী ভাবেন। গাড়িও তাঁদের কাছে রোগীর মতো। নিজের রোগী অন্যকে দিয়ে ভরসা পান না বলে তাঁরা নিজেদের গাড়ি নিজেরাই চালান। তবে ইনি ব্যতিক্রমী ডাক্তার। কারণ তাঁর গাড়ি ড্রাইভার চালাচ্ছে। তিনি হাত-পা ছড়িয়ে পেছনের সীটে বসেছেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম।

'পান খাবেন হিমু সাহেব?'

'জ্বি-না।'

'পান খাওয়ার এক বিশ্রী অভ্যাস এক রোগী আমাকে ধরিয়ে দিয়ে গেছে। আমি জন্মেও পান খেতাম না। সেই রোগী রূপার তৈরী এক পানের কৌটা বের করে বলল, পান খাবেন ডাক্তার সাহেব? আমি কৌটা দেখে মুগ্ধ হয়ে একটা পান নিলাম। সেই থেকে শুরু। এখন দিনরাত পান খাই। পান কেনা হয় পণ হিসাবে।'

'সব বড় জিনিস ছোট থেকে শুরু হয়।'

'ঠিক বলেছেন — **You start by killing a bird, you end by killing a man.** আপনি নামবেন কোথায়?'

'যে-কোনো এক জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে।'

'সে কী! পার্টিকুলার কোথাও নামতে চান না?'

'জ্বি-না। আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, আমার এক বন্ধুকে কি আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন। উনিও কি আপনার মতো?'

'না। আমরা কেউ কারো মতো নই ডাক্তার সাহেব। আমরা সবাই আলাদা।'

'আমার কাছে আনতে চাচ্ছেন কেন?'

'ঐ ভদ্রলোকের একটা সমস্যা আছে। উনি থাকেন খিলগাঁয়। একতলা বাসা। উনার বাড়ির সামনে কোনো গাছপালা নেই। কিন্তু উনি সবসময় বাড়ির সামনে একটা প্রকাণ্ড আমগাছ দেখেন। এর মানে কি?'

'ভদ্রলোককে একবার নিয়ে আসবেন।'

'আচ্ছা, আনব।'

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি?'

'চলুন আমার সঙ্গে। আমার বাসায় চলুন — একসঙ্গে ডিনার করব। আপত্তি আছে?'

'না, আপত্তি নেই।'

আমরা ধানমণ্ডি তিন নম্বর রোডে কম্পাউন্ড দেয়া দোতলা একটা বাসার সামনে থামলাম। গেটটা খোলা। গেটের সামনে জটলা হচ্ছে। জানা গেল — এই বাড়ির ছোট মেয়েটা কিছুক্ষণ আগে গরম পানির গামলায় পড়ে ঝলসে গেছে। তাকে অ্যাম্বুলেন্স এসে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ডাক্তার ইরতাজুল করিম ছুটে ভেতরে চলে গেলেন। আমি একা-একা দাঁড়িয়ে রইলাম।

ডাক্তার সাহেব প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরলেন। যান্ত্রিক গলায় বললেন, চেম্বার থেকে ফিরে আমি সবসময় গরম পানিতে গোসল করি। ঘরে ওয়াটার হীটার আছে। আজই হীটারটি কাজ করছিল না বলে আমার জন্যে পানি গরম করেছে।

আমি বললাম, খুব বেশি পুড়েছে?

ডাক্তার সাহেব নিচু গলায় বললেন, হ্যাঁ। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

'চলুন, আমরাও হাসপাতালে যাই।'

ডাক্তার সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, আপনাকে হাসপাতালে যেতে হবে না। সরি, আপনাকে আজ ডিনার খাওয়াতে পারছি না।

৬

মোরশেদ সাহেব সম্ভবত বাসায় ফেরেননি। এখন সবে সন্ধ্যা। যাদের ঘরে কোনো আকর্ষণ নেই তারা সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফেরে না। ঠিক সন্ধ্যায় তারা একধরনের অস্থিরতায় আক্রান্ত হয়। এই অস্থিরতা শুধু মানুষের বেলাতেই যে হয় তা না — পশুপাখিদের ক্ষেত্রেও হয়। সেই কারণেই হয়তো সব ধর্মে সন্ধ্যা হল উপাসনার সময়। মনের অস্থিরতা দূর করে মনকে শান্ত করার এক বিশেষ প্রক্রিয়া। পরম রহস্যময় মহাশক্তির কাছে আবেদন — আমাকে শান্ত কর। আমার অস্থিরতা দূর কর।

দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে ভেবে রাখি মনে মনে
কর্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায় বসিব তোমারি সনে।

খোলা গেট দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। ঘর অন্ধকার, তবে দরজায় তালা নেই। কয়েকবার ধাক্কা দিতেই মোরশেদ সাহেব দরজা খুলে দিলেন। মুখ শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। মাথা ভেজা।

'কি ব্যাপার মোরশেদ সাহেব?'

'কিছু না ছোটমামা। আসুন, ভেতরে আসুন।'

'শরীর খারাপ?'

'জ্বি, দুপুরে একবার এপিলেপটিক সিজার হল। মেঝেতে পড়েছিলাম। ঘরে কেউ ছিল না।'

'একা থাকেন?'

'জ্বি।'

'বাতি জ্বালাননি কেন? সন্ধ্যাবেলা বাড়িঘর অন্ধকার দেখলে ভাল লাগে না।'

মোরশেদ সাহেব বাতি জ্বালালেন। আমি বসতে-বসতে বললাম, আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই? ওদের কাউকে সঙ্গে এনে রাখতে পারেন না? আপনি অসুস্থ মানুষ। একজন কারো তো আপনার সঙ্গে থাকা দরকার।

'ছোটভাই আছে। সে কানাডায় থাকে। ছোটবোন ঢাকাতেই আছে। ওর নিজের স্বামী-সংসার আছে। ওকে বিরক্ত করতে ইচ্ছা করে না। আমি হলাম সবার বড়।'

'এষার সঙ্গে কি এর মধ্যে দেখা হয়েছে?'

'জ্বি, দেখা হয়েছে। ও এসেছিল।'

'নিজেই এসেছিল! — বাহ্, ভাল তো!'

'ওর দাদীমাকে নিয়ে এসেছিল। আমাকে বোঝাল যে ডিভোর্সই আমাদের দু'জনের জন্যে মঙ্গলজনক। আমিও দেখলাম এরা ঠিকই বলছে। তা ছাড়া বেচারি আমার সঙ্গে থাকতে চাচ্ছে না। আমি তো জোর করে কাউকে ধরে রাখতে পারি না।'

'তা তো বটেই। পশুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা যায়, মানুষকে যায় না।'

'আমি এষার সঙ্গে ম্যারিজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে কাগজপত্রে সই করে এসেছি।'

'ভাল করেছেন।'

'এষার জন্যে হয়তো ভাল করেছি, আমার জন্যে না। আমার মনটা খুব খারাপ। মামা, আপনাকে চা করে দি। ঘরে আর কিছু নেই — শুধু চা।'

'শুধু চা'ই দিন। রান্নাবান্না কি আপনি নিজেই করেন?'

'চা-টা নিজেই বানাই, বাকি খাবার হোটেল থেকে খেয়ে আসি। সেখানেও বেশিদিন যাওয়া যাবে না। গেলেই টাকার জন্যে তাগাদা দেয়। আচ্ছা মামা, আমার ক্যামেরাটা বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন? এর সঙ্গে আলাদা একটা ঝুম লেন্স আছে। লেন্সটা আমার ভাই কানাডা থেকে পাঠিয়েছে।'

'আপনার ভাইয়ের কাছে কিছু টাকাপয়সা চেয়ে চিঠি লিখলে কেমন হয়?'

'না না, তায় হয় না। ছোট ভাই তো। আপনি ক্যামেরা বিক্রির ব্যবস্থা করে দিন।'

'ক্যামেরা বিক্রির টাকা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কী করবেন?'

'আমি বেশিদিন বাঁচব না, ছোটমামা। আমার শরীর খুব খারাপ। নতুন একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। আগে ছিল না।'

'কি উপসর্গ?'

'মাথার ভেতরে ঝিঁঝি পোকা ডাকে। ঝিঁঝি শব্দ হয়। সবসময় যদি হত তা হলে আমি অভ্যস্ত হয়ে যেতাম। সবসময় হয় না। মাঝে-মাঝে হয়।'

আমি চা খেলাম। মোরশেদ সাহেবের ঘর-দুয়ার দেখলাম। একা মানুষ, কিন্তু ঘর খুব সুন্দর করে সাজানো। দেখতে ভাল লাগে।

'মোরশেদ সাহেব।'

'জ্বি ছোটমামা?'

'আপনার ঘর তো খুব সুন্দর করে সাজানো। দেয়ালে ছবি নেই কেন? আপনার এত দামী ক্যামেরা। ঘরভর্তি ছবি থাকা উচিত।'

'ছবি ছিল। অনেক ছবি ছিল। সব এষার ছবি। এষা বলল, আমার ছবি দিয়ে ঘর ভর্তি করে রাখার তো কোনো মানে নেই। তোমার এখন উচিত আমাকে দ্রুত ভুলে যাওয়া। ছবি থাকলে তুমি তা পারবে না। তা ছাড়া তুমি নিশ্চয়ই আবার বিয়ে করবে। তোমার নতুন স্ত্রী আমার ছবি দেখলে রাগ করবে। ছবিগুলি তুমি আমাকে দিয়ে দাও। আমি দিয়ে দিলাম।'

'ভাল করেছেন। চলুন আমরা এখন বের হই।'

'কোথায় যাব?'

'আমার একটা চেনা ভাতের হোটেল আছে, আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি। ওদের রান্না খুব ভাল। তারচে' বড় কথা — বাকিতে খাওয়া যাবে। মাস পুরালেই টাকা দিতে হবে তাও না। একসময় দিলেই হল।'

মোরশেদ সাহেব উজ্জ্বল মুখে বললেন, চলুন। ক্যামেরাটা কি এখন দিয়ে দেব?

'দিন।'

মজনু মিয়া আমাকে দেখেই গম্ভীর মুখে বলল, হিমু ভাই। আপনার সাথে আমার কিছু প্রাইভেট কথা আছে।

'প্রাইভেট কথা শুনব, তার আগে আপনি আমার এই ভাগ্নেকে দেখে রাখুন। এর নাম মোরশেদ। এ আপনার এখানে খাবে। টাকাপয়সা একসময় হিসেব করে দেয়া হবে। আপনি খাতায় লিখে রাখবেন।'

মজনু মিয়া বিরস মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন কেন?

'আপনার সাথে আমার প্রাইভেট কথা আছে।'

'বলুন প্রাইভেট কথা, শুনছি।'

'আসেন, বাইরে আসেন।'

আমি মোরশেদকে বসিয়ে বাইরে এলাম। মজনু মিয়া দুঃখিত গলায় বলল, আমি আপনারে খুবই পেয়ার করি, হিমু ভাই।

'তা জানি।'

'আপনার উপর মনটা আমার খুব খারাপ হয়েছে। কাজটা আপনি কী

করলেন?'

'কোন কাজ?'

'ঐদিন দুপুররাতে মোস্তফাকে বললেন, মোরগ-পোলাও কর। আপনারা সাতটা মানুষ মিলে চারটা মুরগি খেয়ে ফেলেছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, খেয়েছেন ভাল করেছেন — চার মুরগির জন্য মজনু মিয়া মরে যাবে না।'

'তা হলে সমস্যা কি?'

'ঐ রাতে আপনে বললেন, আমি দুই দিন হোটেলে আসব না। বলেন নাই?'

'বলেছি।'

'কথাটা আপনে এদের বলতে পারলেন, আমারে বলতে পারলেন না?'

'আপনাকে বললে কী হত?'

'আমি সাবধান থাকতাম। সাবধান থাকলে কি অ্যাকসিডেন্ট হয়?'

'অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল?'

মজনু মিয়া বিরক্ত মুখে বলল, আপনি এমন একটা ভাব ধরলেন যেন কিছুই জানেন না। আপনি পীর-ফকির মানুষ — কামেল আদমী — এটা আর কেউ না জানুক, আমি জানি। আপনারে যে খাতির করি — ভালবাসা থেকে যতটা করি, ভয়ে তারচে' বেশি করি। কখন কি ঘটনা ঘটবে এটা আপনি আগেভাগে জানেন। জানেন না?

আমি কিছু বললাম না। মজনু মিয়া বলল, আপনি ঠিকই জানতেন যে আমার অ্যাকসিডেন্ট হবে। রিকশা থেকে পড়ে পা মচকে যাবে। তার পরেও আমাকে না বলে অন্য সবেরে বললেন। কাজটা কি ঠিক হল হিমু ভাই?

'বেশি ব্যথা পেয়েছেন?'

'অল্পের জন্যে পা ভাঙ্গে নাই। মচকে গেছে। সাত দিন হয়ে গেছে, এখনো ঠিকমতো পা ফেলতে পারি না। চিলিক দিয়ে ব্যথা হয়।'

'আপনার প্রাইভেট কথা শেষ হয়েছে মজনু মিয়া?'

'জ্বি, শেষ হয়েছে। আবার এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছেন — দেখে তো মনে হয় — মাথা আউলা। ইয়াদ সাহেবের মতো যন্ত্রণা করবে।'

'ইয়াদ কি এখনো আসে? তাকে তো আসতে নিষেধ করেছি।'

'না, উনি আর আসেন না। উনি আছেন কেমন?'

'জানি না কেমন। অনেক দিন দেখা হয় না। ভালই আছে মনে হয় — মজনু মিয়া, ক্যামেরা কিনবেন?'

'ক্যামেরা?'

'জ্বি, ক্যামেরা মিনোলটা। সঙ্গে যুম লেন্স আছে।'

'আমি ক্যামেরা দিয়ে কি করব? আমি বেচি ভাত।'

'ভাতের ছবি তুলবেন। পৃথিবীতে সবচে' সুন্দর ছবি হল — ভাতের ছবি। ধবধবে শাদা।'

মজনু মিয়া বিরক্ত হয়ে বলল, আপনি বড় উল্টাপাল্টা কথা বলেন হিমু ভাই। আগা-মাথা কিছুই বুঝি না।'

'ক্যামেরা কিনবেন না?'

'জ্বি-না।'

'জিনিসটা কিন্তু ভাল ছিল। সস্তায় ছেড়ে দিতাম।'

'মাগনা দিলেও আমি নিব না, হিমু ভাই। আসেন চা খান। নাকি ভাত খাবেন? ভাল সরপুটি আছে।'

'ভাত খাব না। ক্যামেরা বিক্রির চেষ্টা করতে হবে। চলি মজনু মিয়া।'

আমি চলে গেলাম তরঙ্গিণী স্টোরে। মুহিব সাহেব নেই। নতুন একটি ছেলে বিরস মুখে দরজা বন্ধ করছে। রাত মাত্র এগারোটা, এর মধ্যেই দোকান বন্ধ। আমি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললাম, ভাল আছেন? সে সরু চোখে তাকাল। কিছু বলল না।

'মুহিব কোথায়?'

'উনার চাকরি চলে গেছে। উনি কোথায় আমি জানি না।'

'চাকরি গেল কেন?'

'জানি না। মালিক জানে। আপনে উনার কে হন?'

'কেউ হই না। টেলিফোন করতে এসেছি। টেলিফোন করা যাবে?'

'জ্বি-না। মালিকের নিষেধ আছে।'

'পাঁচটা টাকা যদি আপনাকে দিই তাহলে করা যাবে?'

লোকটা টেলিফোন খুলে দিল। আমি ডায়াল ঘোরাতে-ঘোরাতে বললাম, মুহিবকে বদলে আপনাকে নেয়া মালিকের ঠিক হয়নি। আপনার হল চোর-স্বভাব। মাত্র পাঁচ টাকার জন্যে মালিকের নিষেধ অমান্য করেছেন। এক শ' টাকার জন্যে দোকান খালি করে দেবেন।

লোকটা আমার দিকে ভীত চোখে তাকাচ্ছে। আমি তাকে অগ্রাহ্য করে বললাম, হ্যালো।

ওপাশ থেকে ডাক্তার ইরতাজুল করিম বললেন, কাকে চাচ্ছেন?

'আপনাকে। আমি হিমু। চিনতে পারছেন?'

'পারছি। কি চান?'

'কিছু চাচ্ছি না। আপনি কি ক্যামেরা কিনবেন? ভাল ক্যামেরা।'

'হিমু সাহেব, রাতদুপুরে আমি রসিকতা পছন্দ করি না।'

'এটা কিন্তু সাধারণ ক্যামেরা না। এর সঙ্গে দু'জন মানুষের ভালবাসার এবং ভালবাসা ভঙ্গের ইতিহাস জড়ানো আছে। আমি আপনাকে সস্তায় দেব।'

খট করে শব্দ হল। ডাক্তার ইরতাজুল করিম টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

রাত ঠিক সাড়ে এগারোটায় আমি নীতুকে টেলিফোন করলাম। নীতু আমার গলা খুব ভাল করে চেনে। তবু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আপনি কে বলছেন?

আমি বললাম, সরি, রং নাম্বার হয়েছে।

নীতু তৎক্ষণাৎ বলল, রং নাম্বার হয়নি। আপনি ঠিকই করেছেন। ইয়াদকে চাচ্ছেন? ও বাসায় নেই।

'আমি ইয়াদকে চাচ্ছি না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আমার সঙ্গে আবার কী কথা?'

'জরুরি কথা।'

'টেলিফোনে বলা যাবে? টেলিফোনে বলা না গেলে, আপনি চলে আসুন। গাড়ি পাঠাচ্ছি। আপনি কোথায় আছেন বলুন।'

'গাড়ি পাঠাতে হবে না। টেলিফোনে বলা যাবে। আপনি কি একটা ক্যামেরা কিনবেন?'

'কি কিনব?'

'ক্যামেরা। সিঙ্গেল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা। অটোম্যাটিক ম্যানুয়েল দু'টাই আছে। প্লাস একটা যুম লেন্স। সেকেন্ড হ্যান্ড হলেও ভাল জিনিস।'

'চোরাই মালের ব্যবসা কবে থেকে শুরু করলেন?'

'চোরাই মাল নয়। জেনুইন পার্টির ক্যামেরা। কিনবেন কিনা বলুন।'

'আপনার কী করে ধারণা হল যে আমার ক্যামেরা নেই? সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরা কেনার জন্যে আমি আগ্রহী . . . ?'

আমি গম্ভীর ভঙ্গিতে বললাম, খুব যারা বড়লোক, সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিসের প্রতি তাদের একধরনের আগ্রহ থাকে। বঙ্গবাজারে যেসব পুরানো কোট বিক্রি হয় — তাদের বড় ক্রেতা হলেন কোটিপতিরা। তারাই আগ্রহী ক্রেতা।

'কোটিপতিদের সম্পর্কে আপনার খুব ভ্রান্ত ধারণা হিমু সাহেব। কোটিপতিদের কোনোকিছু সম্পর্কেই আগ্রহ থাকে না। যাই হোক, আপনার সঙ্গে আমি তর্কে যেতে চাচ্ছি না। আপনার ক্যামেরা আমি কিনব না। তবে কত টাকার আপনার দরকার আমাকে বলুন, আমি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

'হাজার পাঁচেক দিতে পারবেন?'

'এখন পাঠাব?'

'জ্বি, পাঠিয়ে দিন।'

'কোথায় আছেন ঠিকানা বলুন।'

'আমাকে পাঠাতে হবে না। আমি এক ভদ্রলোকের ঠিকানা দিচ্ছি — তাঁর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেই হবে।'

আমি মোরশেদ সাহেবের ঠিকানা দিলাম। টেলিফোনে শুনতে পাচ্ছি — নীতু খসখস করে লিখছে।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি?'

'আপনার একটা চিঠি পাঞ্জাবির পকেটে ছিল। পেয়েছেন? ইয়াদকে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম।'

'পেয়েছি।'

'পড়েছেন?'

'পুরোটা পড়তে পারিনি — অর্ধেকের মতো পড়েছি।'

'আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন যে পুরো চিঠি আপনি পড়েন নি অর্ধেক পড়েছেন?'

'বিশ্বাস করতে বলছি।'

'আপনার আচার-আচরণে কতটা সত্যি আর কতটা ভান, দয়া করে বলবেন?'

'ফিফটি-ফিফটি। অর্ধেক ভান, অর্ধেক সত্যি।'

'এই চিঠিটা আমি পড়ে ফেলেছি। কিছু মনে করবেন না। আই অ্যাম সরি। আচ্ছা, আপনি কি রূপা মেয়েটিকে নিয়ে একদিন আসবেন আমাদের বাসায়? — উনাকে দেখব। উনি যদি আসতে না চান — আমি আপনার সঙ্গে যেতে রাজি আছি।'

'আচ্ছা, একদিন নিয়ে যাব।'

৭

এষা দরজা খুলে তাকিয়ে রইল। মনে হচ্ছে আমাকে চিনতে পারছে না। মাফলার দিয়ে মাথা ঢাকা। চিনতে না পারার সেটা একটা কারণ হতে পারে।

'কেমন আছেন?'

এষা যন্ত্রের মতো বলল, ভাল।

'আপনার পরীক্ষা কেমন হল খোঁজ নিতে এলাম।'

'ভেতরে আসুন।'

আমি ভেতরে ঢুকলাম। এষা দরজা বন্ধ করে দিল। রাত আটটা বাজে। টিভিতে বাংলা খবর হচ্ছে। খবর পাঠকের মুখ দেখা যাচ্ছে, কথা শোনা যাচ্ছে না। এদের বাড়ি পুরোপুরি নিঃশব্দ। একটু অস্বস্তি লাগে।

'আপনার দাদীমা ভাল আছেন?'

'হ্যাঁ, ভালই আছেন।'

'কাজের মেয়েটা যে চলে গিয়েছিল, ফিরেছে?'

'না।'

'আমি কি বসব?'

'বসুন।'

আমি বসলাম। এষা আমার মুখোমুখি বসল। তার চোখে আজ চশমা নেই। সে মনে হয় শুধু পড়াশোনার সময়ই চোখে চশমা দেয়। মেয়েটার চোখ দু'টা খুব সুন্দর। আজ এষাকে আরো সুন্দর লাগছে। একটু বোধহয় রোগাও হয়েছে। কানে সবুজ পাথরের দু'টা দুল। ঐ রাতে দুল দেখিনি।

'হিমু সাহেব, ঐদিন আপনি আমাদের কিছু না বলে চলে গেলেন কেন?'

'আপনি আপনার হাসব্যান্ডের সঙ্গে কথা বলছিলেন, কাজেই আপনাদের বিরক্ত করলাম না। বিদেয় হয়ে গেলাম।'

এষা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমি হাসব্যান্ডের সঙ্গে কথা বলছিলাম আপনাকে কে বলল? ও বলেছে?

'আমি অনুমান করেছি। তারপর মোরশেদ সাহেবের সঙ্গে কথাও বললাম।

উনার খিলগাঁর বাসাতেও গিয়েছি।'

'আমি আপনার ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না। ওকে কি আপনি আগে থেকে চিনতেন?'

'না, চিনতাম না। ঐ রাতেই প্রথম পরিচয় হল।'

'সঙ্গে সঙ্গে বাসায় চলে গেলেন! সবসময় তাই করেন?'

'কাউকে পছন্দ হলে করি। উনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। খুব পছন্দ হয়েছে।'

এষা চাপা গলায় বলল, পাগল কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যায় না, এমন মানুষরা কমপেনিয়ন হিসেবে খুব ভাল। সাধারণ মানুষরা বোরিং হয়, কিন্তু এরা বোরিং হয় না।

'আপনার কাছে কিন্তু হয়েছে।'

'আমার কাছে হয়েছে, কারণ আমাকে তার সঙ্গে জীবনযাপন করতে হয়েছে। একজন বিকৃতমস্তিস্ক মানুষের সঙ্গে জীবনযাপন ক্লান্তিকর ব্যাপার। যাই হোক, আপনি এসেছেন যখন বসুন। দাদীমা বাসায় নেই, উনি চলে আসবেন। আপনি চা খেতে পারেন, আজ ঘরে চা চিনি সবই আছে।'

'আমি আজ উঠব। কোনো-একদিন ভোরবেলায় আসব।'

'না — আপনি বসবেন। দাদীমা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আপনি চলে যাওয়ায় ঐদিন আমার উপর খুব রাগ করেছিলেন। উনার ধারণা—আমিই আপনাকে বিদেয় করে দিয়েছি। আজ আপনি দাদীমা'র মাথা থেকে ঐ ধারণা দূর করবেন এবং আপনার ঠিকানা লিখে রেখে যাবেন।'

'আপনার দাদীমা না আসা পর্যন্ত আমাকে এখানে একা-একা বসে থাকতে হবে?'

'আমি থাকব আপনার সঙ্গে। একা বসিয়ে রাখব না।'

'আমরা কী নিয়ে কথা বলব? দু'জন মানুষ তো চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকতে পারে না। আমাদের কথা বলতে হবে।'

'বলুন কথা।'

'আপনার দাদীমা'র কি ফিরতে রাত হবে?'

'বেশি রাত হবার কথা না। তিনি জানেন আমি এখানে একা আছি।'

আমি টিভির দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। শব্দহীন খবর পাঠ দেখতে মন্দ লাগছে না। এরও একটা আলাদা মজা আছে। খবর পাঠকদের কখনোই খুব খুঁটিয়ে দেখা

হয় না, তাঁদের কথাই শুধু শোনা হয়। কথা বন্ধ করে দিলেই শুধু ব্যক্তি হিসেবে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েন। তাঁদের খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি?'

'ও যে অসুস্থ সেই খবরটি কি আপনাকে দিয়েছে?'

'এপিলেপ্সির কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'জ্বি, উনি আমাকে বলেছেন।'

'বিয়ের আগে কিন্তু আমাদের কিছু বলেনি। এমন ভয়ংকর একটা অসুখ সে গোপন করে গেছে।'

'বিয়ের আগে অসুখটা হয়ত ভয়ংকর ছিল না।'

'সবসময়ই ভয়ংকর ছিল। ছ' বছর বয়স থেকেই এই অসুখ নিয়ে সে বড় হয়েছে।'

'তা হলে মনে হয় — উনি অসুখে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় এটা হয়েছে। উনি ধরেই নিয়েছেন, তাঁর অসুখের ব্যাপারটা সবাই জানে, নতুন করে কাউকে কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই। ইচ্ছা করে যে তিনি ব্যাপারটা গোপন করেছেন তা আমার মনে হয় না।'

'আপনি কি তাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করছেন?'

'তা করছি। উনি আমার বন্ধুমানুষ। বন্ধুকে বন্ধু ডিফেন্ড করবে। বাইরের কেউ করবে না। তা ছাড়া এখন তো আপনারা আলাদা হয়ে গেছেন। উনার যা কিছু মন্দ তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? উনার ভাল যদি কিছু থাকে তা নিয়ে থাকুন।'

'ওর ভাল কিছু নেই। ও পুরোপুরি অসুস্থ একজন মানুষ। ওর খিলগাঁ বাসায় আপনি গিয়েছেন। সেখানে কি কোনো আমগাছ দেখেছেন? দেখেননি। ও কিন্তু প্রায়ই বাসার সামনে একটা আমগাছ দেখে। আমগাছের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। একবার রাতদুপুরে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলল, এষা, চল আমরা দু'জন গাছটার নিচে বসি।'

'আপনি নিশ্চয়ই বসতে যাননি?'

'না, যাইনি।'

'গেলে ভাল হত। আপনি যদি বলতেন — চল যাই বসি গাছের নিচে। কিংবা যদি বলতেন — তোমার এই আমগাছের ডালে একটা দোলনা টানিয়ে দাও — আমি

দোলনায় চড়ব — তাহলে খুব ইন্টারেস্টিং হত।'

'এতে কি পাগলামির প্রশ্রয় দেয়া হত না?'

'না, হত না। আপনি যাকে পাগলামি ভাবছেন তা হয়তো পাগলামি নয়। আলেকজান্ডার পুশকিন তাঁর বাড়ির পেছনে সব সময় একটা দিঘি দেখতে পেতেন। জোছনা রাতে দিঘির পাড়ে বেড়াতে যেতেন।'

'একজন বিখ্যাত ব্যক্তি পাগলামি করে গেছেন বলেই পাগলামিকে স্বীকার করতে হবে?'

'না, হবে না, এম্নি বললাম। আপনি ঐ লোককে ছেড়ে এসে ভালই করেছেন। ও বেশিদিন বাঁচবেও না। স্বামীর মৃত্যু আপনাকে দেখতে হবে না। আপনাকে বিধবা শব্দটার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে না। বিধবা খুব পেলেটেবল শব্দ নয়। তা ছাড়া একজন ভয়াবহ অসুস্থ, রুগ্ণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করবেন কেন? একটাই আপনার জীবন। একটাই পৃথিবী। দ্বিতীয় কোনো পৃথিবী আপনার জন্যে নেই। সেটাকে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া মোরশেদ সাহেবের আপনাকে প্রয়োজন নেই, তাঁর আছে নিজস্ব পৃথিবী, নিজস্ব আমগাছ। অল্প যে-ক'দিন বাঁচবেন, তিনি তাঁর আমগাছ নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবেন। আপনার তো কোনো আমগাছ নেই — কাজেই আপনার একজন বন্ধু প্রয়োজন। ওমর খৈয়াম পড়েছেন? —

এইখানে এই তরুর তলে
    তোমার আমার কৌতূহলে
যে ক'টি দিন কাটিয়ে যাব প্রিয়ে
    সঙ্গে রবে সুরার পাত্র
    অল্প কিছু আহার মাত্র
আরেকখানি ছন্দ মধুর কাব্য হাতে নিয়ে।'

'ও মারা যাবে কেন?'

'শরীর খুবই খারাপ। তা ছাড়া টাকাপয়সাও নেই। বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে। বাড়িওয়ালা খুব তাড়াতাড়িই মনে হয় বাড়ি থেকে বের করে দেবে। তখন খেয়ে না খেয়ে, পথে-পথে ঘুরতে গিয়ে কিছু-একটা ঘটিয়ে ফেলবেন।'

'আপনি জানেন না, ওর অনেক বড়-বড় আত্মীয়স্বজন আছে।'

'ঐ লোক কি আত্মীয়স্বজনের কাছে যাবে? হাত পাতবে ওদের কাছে?'

'না।'

'এষা, এখন আমি উঠব। আরেকদিন আসব। আপনার দাদীমা'র জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। রাত ন'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ন'টা প্রায় বাজতে চলল।'

'কবে আসবেন?'

'খুব শিগগিরই আসব। এষা, আপনাকে আরেকটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। কথাটা হচ্ছে — আমার কথাবার্তা থেকে দয়া করে কোনো ভ্রান্ত ধারণা নেবেন না। মনে করবেন না আমি খুব কায়দা করে মোরশেদ সাহেবের কাছে আপনাকে ফিরে যেতে বলছি।'

'আপনি বলছেন না?'

'অবশ্যই না। মোরশেদ সাহেব যদি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতেন আমি হয়তো-বা বলতাম। সেই সম্ভাবনা একেবারেই নেই। উঠি এষা।'

ডক্টর ইরতাজুল করিম সাহেবও ঠিক এষার মতো ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালেন, যেন চিনতে পারছেন না।

'স্লামালিকুম ডাক্তার সাহেব, আমি হিমু।'

'কি ব্যাপার?'

'আপনার সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট?'

'আপনি ডাইরিতে লিখে রেখেছেন। প্রথম যেদিন এসেছিলাম সেদিনই বলেছিলেন এক সপ্তাহ পর রাত ন'টার দিকে আসতে। বসব?'

'বসুন।'

'শুরু করব?'

'কী শুরু করতে চাচ্ছেন?'

'জীবন-কাহিনী। আমার বাবা কি করে আমাকে মহাপুরুষ বানানোর চেষ্টা করতে লাগলেন, তিনি কতটুকু পারলেন, কতটুকু পারলেন না। অর্থাৎ ঐ রাতে যেখানে শেষ করেছিলাম, সেখান থেকে শুরু . . . .'

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি?'

'আমার একটি মেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। আপনি সেই খবর খুব ভাল করেই জানেন। ওর এখন স্কিন গ্রাফটিং হচ্ছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গা

থেকে চামড়া কেটে লাগানো হচ্ছে। আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। রোগী দেখছি না। কিছু করার নেই বলে চেম্বারে এসে বসেছি।'

'আমি তা হলে চলে যাই?'

'এসেছেন যখন বসুন। আমার কাছে আপনার একটি ডিনার পাওনা আছে। আসুন, আমরা একসঙ্গে ডিনার করি। ঘরে গত সাত দিন ধরে রান্নাবান্না হচ্ছে না। আমার স্ত্রী থাকেন হাসপাতালে, কাজেই আমরা কোনো-একটা হোটেলে বসব। আপনার আপত্তি আছে?'

'না, আপত্তি নেই।'

'চলুন তাহলে ওঠা যাক।'

আমরা গুলশান এলাকার একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। ডাক্তার সাহেব বললেন, এই রেস্টুরেন্টটা ছোট, কিন্তু খাবার খুব ভাল। এদের কুক একজন ভিয়েতনামি মহিলা। তিনি খাবার তৎক্ষণাৎ তৈরি করে দেন। আপনি কি খাবেন মেনু দেখে অর্ডার দিন। আমি নিজে শুধু একটা স্যুপ খাব। আপনি কি মদ্যপান করেন?

'জ্বি-না।'

'বিয়ার? বিয়ার নিশ্চয়ই চলতে পারে।'

'আপনি খান। আমার লাগবে না।'

বিয়ারের ক্যান খুলতে-খুলতে ডাক্তার সাহেব বললেন, আমি আপনার একটি বিষয় জানার জন্যে আগ্রহী। আপনার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা কি সত্যি আপনার আছে?

'আমি ঠিক জানি না। মাঝে-মাঝে যা ভাবি তা হয়ে যায়। সে তো সবারই হয়। আপনারও নিশ্চয়ই হয়?'

'না, আমার হয় না।'

'অবশ্যই হয়। ভাল করে ভেবে দেখুন — এরকম কি হয় না যে আপনি দুপুরে বাসায় ফিরছেন — আপনার মনে হল আজ বাসায় বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছ রান্না হয়েছে। খেতে বসে দেখেন, সত্যি তাই।'

'এটা হচ্ছে কো-ইনসিডেন্স।'

'আমার ব্যাপারগুলিও কো-ইনসিডেন্স। এর বাইরে কিছু না।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার কোনো ক্ষমতা নেই?'

'না।'

ডাক্তার সাহেব তিনটি বিয়ার শেষ করে চতুর্থ বিয়ারের ক্যানে হাত দিলেন। মদ্যপানে তিনি খুব অভ্যস্ত বলে মনে হচ্ছে না। চোখটোখ লাল হয়ে গেছে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি?'

'আমার কিন্তু ধারণা, আপনার ক্ষমতা আছে। আপনার বাবা পুরোপুরি ব্যর্থ হননি — Strange কিছু জিনিস আপনার ভেতর তৈরি করতে পেরেছেন। তার একটি হচ্ছে মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা আপনার প্রচুর আছে।'

'এই ক্ষমতা অল্পবিস্তর সবারই আছে।'

'আপনার অনেক বেশি আছে। ইয়াদ সাহেবের সঙ্গে কি রিসেন্টলি আপনার দেখা হয়েছে?'

'না।'

'আপনি কি জানেন তিনি গত দু' দিন ধরে ভিক্ষুক সেজে পথে-পথে ঘুরছেন? দু' রাত বাড়ি ফেরেননি?'

'না — জানি না।'

'ইয়াদ সাহেবের স্ত্রী আপনি আসার কিছুক্ষণ আগেই আমার কাছে এসেছিলেন। ভদ্রমহিলা যে কী পরিমাণ মানসিক অর্ডিয়েলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন তা তাঁকে না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব।'

'আপনি তাঁকে কী বলেছেন?'

'বলেছি এটা সাময়িক ঝোঁক। ঝোঁক কেটে যাবে। ইয়াদ সাহেব বাসায় ফিরবেন। আপনার কি ধারণা হিমু সাহেব?'

'কোন ধারণার কথা জানতে চাচ্ছেন?'

'ইয়াদ সাহেব প্রসঙ্গে জানতে চাচ্ছি। উনার ঝোঁক কাটতে কতদিন লাগবে?'

'বলতে পারছি না। ঝোঁক নাও কাটতে পারে।'

'তার মানে?'

খাওয়া বন্ধ করে আমি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললাম, মানুষ খুব বিচিত্র প্রাণী ডাক্তার সাহেব। সে সারা জীবন অনেক কিছুই অনুসন্ধান করে ফেরে। সেই অনেক অনুসন্ধানের একটি হল — তার অবস্থান। সে কোথায় খাপ খায় তা জানতে চায় — সেই বিশেষ জায়গাটা যখন পেয়ে যায় তখন তাঁকে নড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে।

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন হিমু সাহেব, মানুষ খুব Rational প্রাণী।'

'মানুষ মোটেই Rational প্রাণী নয়। সমস্ত পশুপাখি, কীটপতঙ্গ Rational, মানুষ নয়। যখন বৃষ্টি হয়, পাখি তখন বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যে গাছের নিচে আশ্রয় নেয়। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। মানুষের ভেতর ব্যতিক্রম আছে। এদের কেউ-কেউ ইচ্ছা করে বৃষ্টিতে ভেজে। কেউ-কেউ গাছের নিচে দাঁড়ায় ঠিকই, কিন্তু মন পড়ে থাকে বৃষ্টিতে। সে মনে-মনে ভিজতে থাকে।'

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি?'

'আপনি কিছুই খাচ্ছেন না। খাবারটা কি আপনার পছন্দ হচ্ছে না?'

'জ্বি-না, সবকিছুর মধ্যে ধোঁয়া-ধোঁয়া গন্ধ পাচ্ছি।'

ডাক্তার সাহেব বিল মিটিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আপনাকে কোথায় নামিয়ে দেব বলুন।

'কোথাও নামাতে হবে না। আমি এখান থেকেই হেঁটে-হেঁটে চলে যাব।'

'অনেকটা দূর কিন্তু।'

'খুব দূর নয়। আবার কবে আপনার কাছে আসব, ডাক্তার সাহেব?'

'আপনাকে আর আসতে হবে না। আমি আপনার চিকিৎসা করব না।'

'আপনার কি ধারণা আমি অসুস্থ না?'

'বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, গুড নাইট।'

বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত একটা বেজে গেল। মেসের অফিসে বাতি জ্বালিয়ে জীবনবাবু বসে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, আপনার জন্যে বসে আছি হিমু ভাই। আপনাকে বলেছি না, আমি একটা ভয়ংকর বিপদে পড়েছি?

বিপদের কথাটা বলতে চান?

'জ্বি।'

'আসুন আমার ঘরে। বলুন।'

জীবনবাবু অনেকক্ষণ আমার ঘরের চৌকিতে বসে থেকে, কিছু না বলেই চলে গেলেন। খুব জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। আমার ঘরের জানালার একটা কাঁচ ভাঙা। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। জীবনবাবুকে বলতে মনে থাকে না। আজ কী বার? বৃহস্পতিবার? পাশের ঘরে তাস খেলা হচ্ছে। হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। বিছানায় যাবার পর লক্ষ করলাম — মাথাধরা শুরু হয়েছে। ইরতাজুল করিম সাহেবকে এই মাথাধরার কথাটা বলা হয়নি।

৮

টেলিফোন করার জায়গা পাচ্ছি না। গ্রীন ফার্মেসি বন্ধ। কম্পিউটারের নতুন একটা সার্ভিস সেন্টার হয়েছে। ওদের টেলিফোন আছে — গেলেই টেলিফোন করতে দেয়। সার্ভিস সেন্টারটিও বন্ধ। এসেছি তরঙ্গিণী স্টোরে। নতুন ছেলেটা আমাকে দেখেই বলল, টেলিফোন নষ্ট। মিথ্যা বলছে বোঝাই যাচ্ছে। বলার সময় মুখের চামড়া শক্ত হয়ে গেছে। সে মনে হয় আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল — আমাকে দেখলেই বলবে, "টেলিফোন নষ্ট।"

আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, গোটা দশেক টাকা দিলে কি ঠিক হবে?

'বললাম তো নষ্ট।'

'আপনার চাকরি কতদিন হয়েছে?'

'তা দিয়া আপনের কী প্রয়োজন?'

'কোনো প্রয়োজন নেই, এম্নি জিজ্ঞেস করছি। মুহিব এসেছিল এর মধ্যে?'

'না।'

'ওর ঠিকানা জানেন?'

'না।'

'আপনার ঠিকানা কি?'

'আমার ঠিকানা দিয়া কী করবেন?'

ছেলেটা কঠিন গলার স্বর বের করছে। একে বিরক্ত করতে ভাল লাগছে। কি করে আরো রাগিয়ে দেয়া যায় তাই ভাবছি।

'আপনাদের এই দোকান খোলে কখন?'

'খামাখা প্যাচাল পাড়তেছেন ক্যান। সওদা করার থাকলে সওদা করেন, নয়তো যান গিয়া।'

'আপনার ঠিকানাটা তো এখনও বলেননি?'

'আরে দুত্তেরি।'

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, বল পয়েন্ট কলম আছে? দেখান দেখি।

সে একটা কলম সামনে রাখল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কলম দিয়ে খোঁচা মেরে সে যদি আমার চোখ গেলে দিতে পারত তাহলে খুশি হত।

'দাম কত?'

'দশ টাকা।'

'বাংলাদেশি বল পয়েন্ট না?'

'হুঁ।'

'এগুলি তিন টাকা করে বাইরে বিক্রি হয়। আপনার এখানে দশ টাকা কেন?'

'আপনে বাইরে থাইক্যা কিনেন।'

'আমি আপনার এখান থেকেই কিনতে চাচ্ছি। তিন টাকার জিনিস বেশি হলে চার টাকা হবে। তার চেয়েও বেশি হলে হবে পাঁচ। দশ টাকা কেন?'

'দাম বেশি ঠেকলে নিবেন না।'

মানিব্যাগ খুলে আমি আমার শেষ সম্বল দশ টাকার নোটটা দিয়ে তিন টাকা দামের বল পয়েন্ট কিনে বের হয়ে এলাম। টাকার সন্ধানে যেতে হবে। মাসের প্রথম তারিখে ফুপা আমাকে চার শ' টাকা দেন। শর্ত একটাই — আমি কখনো তাঁর বাসায় যেতে পারব না। তাঁর ছেলে বাদল যেন কখনো আমার দেখা না পায়। ফুপার ধারণা, আমার প্রভাবে বাদলের সর্বনাশ হচ্ছে। বাদলকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় আমার কাছ থেকে দূরে রাখা। দু' মাস ফুপার কাছ থেকে টাকা নেয়া হয়নি।

ফুপার অফিসঘরে শীতকালেও এয়ার কুলার চলে। এয়ার কুলারের বিজবিজ আওয়াজ না হলে বোধহয় তাঁর মেজাজ আসে না।

'কেমন আছেন ফুপা?'

ফুপা ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বললেন, ভেতরে আস। অনেক দিন দেখা হয় না। তোমাকে তুই করে বলতাম, না তুমি করে বলতাম ভুলে গেছি। ভাল আছ?

'জ্বি।'

'আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে তুমি জেলে আছ। তোমার মতো লোক দীর্ঘদিন বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে না। একসময়-না-একসময় তাদের জেলে ঢুকতে হয়। এর মধ্যে পুলিশ ধরেনি তোমাকে?'

'না।'

'আমি অবশ্যি বাদলকে বলেছি — তুমি জেলে আছ। তোমার এক বছরের সাজা হয়েছে। না বললে তোমার খোঁজ বের করার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ত।'

'আমি কি বসব ফুপা?'

ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন, অনুমতি নিচ্ছ কেন? বস।

'আপনার অফিসে ঢুকলেই নিজেকে অফিসের একজন কর্মচারী বলে মনে হয়। আপনাকে মনে হয় বড় সাহেব। সামনে বসতে ভয় লাগে।'

ফুপা খুশি হলেন। ফাইল সরিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

'তোমার টাকা আলাদা করে রেখেছি।'

'থ্যাংকস ফুপা।'

'নাও, খাম দু'টা রাখ। চার শ' চার শ' করে আট শ' আছে।'

খাম পকেটে ভরলাম। ফুপা আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে আমার অফিসে কাজ করতে পার। এন্ট্রি লেভেলে অফিসারের একটা পোস্ট খালি হয়েছে। আমরা অ্যাডভার্টাইজ করব না। অ্যাডভার্টাইজ করলে সামাল দেয়া যাবে না। তুমি চাইলে আজই তোমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া যেতে পারে।

'বেতন কত?'

'বেসিক তিন হাজার প্লাস ফর্টি পারসেন্ট হাউস রেন্ট। টু হানড্রেড কনভেন্স। থ্রী হানড্রেড মেডিকেল — হিসেব কর। কত হল?'

'জটিল হিসাব আমাকে দিয়ে হবে না ফুপা। তবে আমি খুব ভাল একজন লোক দিতে পারি। ভেরি অনেস্ট।'

'তোমার কাছে তো আমি লোক চাইনি।'

'তা চাননি। তবু হাতে যখন আছে তখন বললাম। আমার জানামতে তাঁর মতো মানুষ এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নেই। এর উপর আমি আট শ' টাকা বাজি রাখতে পারি। এই টাকটাই আমার সম্বল। আপনি যদি এমন কাউকে পান যে ঐ লোকটার মতো, তাহলে আমি সঙ্গে-সঙ্গে আপনাকে আট শ' টাকা দিয়ে দেব।'

ফুপা চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, কি আছে লোকটার যা অন্য কারোর নেই?

'সে তার বাড়ির সামনে একটা আমগাছ দেখতে পায়, যদিও সেখানে কোনো গাছ নেই। কোনোকালে ছিলও না। সে পরিষ্কার আমগাছ দেখে, গাছে পাখি বসে থাকতে দেখে। পাখির কিচিরমিচির শুনতে পায়।'

ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি এই বদ্ধ উন্মাদকে আমার এখানে চাকরি দিতে চাচ্ছ?

'জ্বি।'

'কেন বল তো?'

'ভদ্রলোকের চাকরি খুব দরকার। উনি অসুস্থ। এপিলেপ্সি আছে। আগে ভাল চাকরি করতেন। এখন চাকরি নেই। যদি চাকরি হয় মানসিক শক্তি পাবেন। এতে

শরীর সুস্থ হতে থাকবে।'

'তোমার ধারণা,আমার অফিস পাগল সারাবার কারখানা?'

'না, তা হবে কেন?'

'একে উন্মাদ, তার উপর এপিলেপটিক পেশেন্ট, তাকে তুমি আমার এখানে চাকরি দেবার কথা ভাবলে কি করে বল তো?'

'আর ভাবব না ফুপা। এখন তাহলে যাই?'

'যাও। খবর্দার, বাসায় আসবে না।'

'বাদল আছে কেমন?'

'ও ভালই আছে। তোমার প্রভাব থেকে দূরে আছে, ভাল না থাকার তো কোনো কারণ নেই।'

'আমি কি ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে পারি ফুপা? অনেক দিন দেখি না — কথা বলতে ইচ্ছা করে।'

'অসম্ভব! টেলিফোন করতে পারবে না। একেবারেই অসম্ভব।'

'বলব — ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে টেলিফোন করা হচ্ছে। মিনিট দুই কথা বলব। দু' মিনিটে কী আর হবে!'

'কিছু হবার থাকলে দু' মিনিটেই হবে। বাদলের মাথা খারাপ হয়েই আছে — ঠিক করার চেষ্টা করছি। তোমার টেলিফোন পেলে — আর ঠিক হবে না। হিমু, তুমি বিদেয় হও। ক্লিয়ার আউট। এখন থাক কোথায়?'

কোথায় থাকি বলতে যাচ্ছিলাম, ফুপা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, থাক, বলতে হবে না। জানতে চাচ্ছি না।

আমি ঘর ছেড়ে বেরুবার আগে বললাম, ফুপা! বাদলের ব্যাপারে একটা ক্ষুদ্র সমস্যা হতে পারে। ঐ সমস্যাটা নিয়ে কি ভেবেছেন?

'কি সমস্যা?'

'আমি জেলে আছি শুনে সেও ভাবতে পারে জেলে যাওয়াটা প্রয়োজনীয়। কাজেই জেলে যাবার একটা চেষ্টা করতে পারে।'

ফুপার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। আমি চলে এলাম। মজনু মিয়ার ভাতের হোটেলে যেতে হবে। ভাতের বিল দিতে হবে। অনেক টাকা বাকি পড়ে আছে।

মজনু মিয়ার হোটেলে খুব ভিড়। প্রচুর কাস্টমার। সবার জায়গা হচ্ছে না। কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মজনু মিয়া টাকা গুনতে হিমশিম খাচ্ছে। আমাকে দেখে শীতল

গলায় বলল, ভাইজান, কথা আছে।

'কি কথা — সাধারণ না প্রাইভেট?'

'প্রাইভেট।'

আমি প্রাইভেট কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বসার জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। মজনু মিয়া তার ছোট ভাইটাকে ক্যাশে বসিয়ে এগিয়ে এল। আমি বললাম, খুব ভাল বিজনেস হচ্ছে, মজনু মিয়া। ব্যাপার কি?

'ব্যবসাপাতি হইল আপনার ভাগ্যের ব্যাপার। কখন কি হয় কিছু বলা যায় না। কয়েকদিন ধরে দেখতেছি আমার সামনের হোটেলের সব বান্ধা কাস্টমার এইখানে আসতেছে।'

'বয়-বাবুর্চি তো বাড়াতে হবে। এরা পারছে না। আরো কয়েকজন নিন।'

'দেখি।'

'আর এদের বেতন বাড়িয়ে দিন।'

'বাজে কথা বলবেন না তো হিমু ভাই। বাজে কথা শুনতে ভাল লাগে না।'

'আচ্ছা যান। বাজে কথা বলব না। আপনার প্রাইভেট কথা শুনব। প্রাইভেট কথাটা কি?'

'আপনি যে আপনার এক ভাগ্নেকে গছায়ে দিয়ে গেলেন — তার আছে মৃগী বেরাম। ঐ দিন দুপুরে শরীর কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল। কেলেঙ্কারি অবস্থা। কাস্টমাররা সব খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে।'

'তাতে অসুবিধা কী?'

'অসুবিধা আছে না? এইরকম রোগী নিয়ে কারবার করলে তো হবে না ভাইজান। দোকানের বদনাম হবে। লোক আসা কমে যাবে। আপনে উনারে আমার দোকানে আসতে নিষেধ করে দেবেন।'

'আচ্ছা, নিষেধ করে দেব।'

'আপনি রাগ হলেও কিছু করার নাই। আপনার জন্য সব মাপ। কিন্তু হিমু ভাই — পাগল, ছাগল, মৃগীরোগী এদের আমি দোকানে ঢুকাব না। ঐদিন আপনার ভাগ্নেরে দেখে আমি কানে হাত দিয়েছি। অনেক কাস্টমার বাইরে দাঁড়া হয়েছিল। গণ্ডগোল দেখে ভিতরে ঢুকে নাই। আপনার ভাগ্নেরে আমি বলে দিয়েছি আর যেন এখানে না আসে।'

'আপনি নিজেই বলে দিয়েছেন?'

'জ্বি ভাইজান, আমিই বলেছি। মৃগীরোগী আমার দরকার নাই।'

'আমি পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললাম, রুগ্ণ মানুষের প্রতি মমতা দেখানোর বদলে আপনি দেখাচ্ছেন ঘৃণা। এটা কি ঠিক হচ্ছে? রোগটা তো আপনারো হতে পারত। তা ছাড়া এই যে আজ আপনার দোকানে এত বিক্রি বেড়েছে, হয়তো আমার ভাগ্নের কারণেই বেড়েছে। এই ক'দিন তাকে যত্ন করে খাইয়েছেন বলেই বেড়েছে। এখন তাকে বিদেয় করে দিয়েছেন — দেখা যাবে হুট করে বিক্রিবাটা পড়ে যাবে।'

'আমাকে ভয় দেখায়ে লাভ নাই হিমু ভাই। আমি ভয় খাওয়ার লোক না। ঐ মৃগীরোগী আমি আর দোকানে ঢুকতে দেব না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'আপনি মনে কিছু নিবেন না হিমু ভাই। আপনার জন্যে আমি আছি। অন্য কারো জন্যে না।'

আমি মজনু মিয়ার টাকাপয়সা মিটিয়ে মোরশেদ সাহেবের খোঁজে গেলাম। খিলগাঁয়ে তাঁর বাড়িতে তাঁকে পাওয়া গেল না। ঘর তালাবন্ধ। বাড়িওয়ালাকে খুঁজে বের করলাম। বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি আমাকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই ঘরে নিয়ে বসালেন। বললেন, উনি বাসা ছেড়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, কোথায় আছে জানেন?

'জ্বি–না।'

'বাসা ছেড়েছেন কবে?'

'গত পরশু। দু' মাসের ভাড়া পাওনা ছিল। উনি ভাড়াটাড়া সব মিটিয়ে দিয়ে গেছেন। আমি বললাম, থাক্, ভাড়া দিতে হবে না। বাদ দেন। রাজি হলেন না।'

'জিনিসপত্রগুলি কোথায়?'

'জিনিসপত্র কিছু তো ছিল না। একটা খাট, কিছু চেয়ার–টেবিল। ঐসব একটা ঘরে তালা দিয়ে রেখেছি। বলেছি, একসময় এসে নিয়ে যাবেন, কোনো অসুবিধা নাই। ভদ্রলোকের উপর মায়া পড়ে গিয়েছিল, বুঝলেন? ভাল চাকরি করছিল, সুন্দর সংসার — হঠাৎ কি হয়ে গেল দেখেন। সব ছারখার। যাবার সময় বাসার সামনে খোলা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে খুব কাঁদছিলেন। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমার বড় বৌমা বলল, বাবা, উনাকে বলেন — বাসা ছাড়ার দরকার নাই। উনাকে থাকতে বলেন। এইগুলা হচ্ছে ভাই ভাবের কথা। সংসার তো ভাই ভাবের কথায় চলে না।'

'তা তো ঠিকই।'

'বিনা পয়সায় থাকতে দিলে আমার চলে কী করে! আমি তো এতিমখানা খুলি নাই। এই কথাই বৌমাকে বুঝায়ে বললাম।'

'উনি কী বললেন?'

'কিছু বলে নাই। চুপ করে ছিল। লক্ষ্মী মেয়ে। শ্বশুরের মুখের উপর কোনো কথা বলবে না। তারপর শুনি — রাতে ভাত না খেয়ে শুয়ে পড়েছে। আমি বললাম, ভাত খাও নাই কেন, মা? সে বলল, মানুষটার জন্যে মনটা খুব খারাপ লাগছে বাবা। ভাত খেতে ইচ্ছা করছে না। কি রকম করে কাঁদছিল! যাই হোক, মেয়েছেলের কথা বাদ দেন। মেয়েছেলে বিড়ালের জন্যেও কাঁদে। এখন বলেন আপনি উনার কে হন?'

'সম্পর্কে মামা হই।'

'ও আচ্ছা। খুশি হয়েছি আপনার সঙ্গে কথা বলে।'

আমি বললাম, আপনার বড় বৌমাকে একটু ডাকবেন?

'কেন?'

'একটু দেখব। ভালমানুষ দেখার মধ্যেও পুণ্য আছে। যদি অসুবিধা না হয় একটু ডাকুন।'

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়েই তাঁর বড় বৌমাকে ডাকলেন। সাদাসিধা সরল চেহারার মেয়ে, দু' বছরের একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কত বয়স হবে মেয়েটির? খুব বেশি হলে উনিশ–কুড়ি। তার কোলের শিশুটিও অবিকল তার মতো দেখতে। মা এবং শিশু যেন একই ছাঁচে তৈরী। আমি বললাম, আপনি কেমন আছেন?

মেয়েটি জবাব দিল না।

আমি বললাম, আপনার ছেলেটার কি নাম রেখেছেন?

মেয়েটি এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। বাচ্চা নিয়ে ভেতরে চলে গেল। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বললেন, আমার বৌমা খুব লাজুক স্বভাবের। বাইরের কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারে না।

আমি বললাম, আমি কথা বলতে চাইওনি। শুধু দেখতে চেয়েছি। আচ্ছা ভাই, যাই।

'আপনার ভাগ্নেকে বলবেন জিনিসপত্র সাবধানে রাখা আছে। যেন চিন্তা না করে।'

'জ্বি আচ্ছা, বলব। আপনার অনেক মেহেরবানী।'

৯

নীতুর একটি চিঠি এসেছে। নীতুর স্বভাবও দেখা যাচ্ছে ইয়াদের মতো। চিঠি পাঠিয়েছে ইংরেজিতে টাইপ করে। ডাকে পাঠায়নি, হাতে-হাতে পাঠিয়েছে। নীতুর ম্যানেজার চিঠি নিয়ে এসেছে। তার উপর নির্দেশ, চিঠি আমার হাতে দিয়ে অপেক্ষা করবে এবং জবাব নিয়ে যাবে।

বড়লোকের ম্যানেজার শ্রেণীর কর্মচারীরা নিজের প্রভু ছাড়া সবার উপর বিরক্ত হয়ে থাকে। এই ভদ্রলোককে দেখলাম মহা বিরক্ত। প্রায় ধমকের স্বরে বলল, কোথায় থাকেন আপনি?

'কেন বলুন তো?'

'এই নিয়ে দশবার এসেছি। বসে যে অপেক্ষা করব সেই ব্যবস্থাও নেই। মেসের অফিস বন্ধ। একজনকে বললাম একটা চেয়ার এনে দিতে, সে আচ্ছা বলে চলে গেল। আর তার দেখা নেই।'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, এর পর যখন আসবেন একটা ফোল্ডিং চেয়ার সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

ম্যানেজারের মুখ কঠিন হয়ে গেল। মনে হচ্ছে এ-জাতীয় কথাবার্তা শুনে সে অভ্যস্ত নয়। নীতুর চিঠি বের করে বলল, চিঠি পড়ে জবাব লিখে দিন। আপা বলেছেন — জবাব নিয়ে যেতে।

'এখন চিঠি পড়তে পারব না।'

ম্যানেজার হতভম্ব গলায় বলল, এখন চিঠি পড়তে পারবেন না?

'জ্বি-না।'

'চিঠি আপা পাঠিয়েছেন।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আপাই পাঠাক আর দিদিমণিই পাঠাক, চিঠি এখন পড়ব না।

'কখন পড়বেন?'

'তাও তো বলতে পারছি না। আমার মাথাধরা রোগ আছে। খারাপ ধরনের মাথাধরা। এখন সেটা শুরু হয়েছে। আমি খুব ঠাণ্ডা পানিতে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করব। তারপর দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমাব। ঘুম থেকে উঠে যদি দেখি মাথাব্যথা

সেরেছে, তখন পড়তে পারি। আবার নাও পারি।'

'জরুরি চিঠি।'

'আমার ঘুমটা চিঠির চেয়েও জরুরি। আপনি বরং এক কাজ করুন, এখন চলে যান। রাতে একবার খোঁজ নেবেন।'

'আপাকে কি বলব আপনি চিঠি পড়তে চাচ্ছেন না?'

আমি ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকালাম, সে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। মানুষজন দ্রুত বদলে যাচ্ছে — সবাই ভয় দেখাতে চায়। ভয় দেখিয়ে কাজ সারতে চায়।

কেউ ভয় দেখালে উল্টা তাকে ভয় দেখাতে ইচ্ছা করে। ম্যানেজার ব্যাটাকে চূড়ান্ত রকমের ভয় কী করে দেখানো যায়? মাথায় কিছুই আসছে না। ম্যানেজার কঠিন মুখ করে বলল, আমি কি উনাকে বলব যে উনি বলেছেন যখন উনার ইচ্ছা হয় তখন পড়বেন। এখন ইচ্ছা হচ্ছে না।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, বলতে পারেন।

'আচ্ছা, বলব।'

'চিঠিটা সঙ্গে করে নিয়ে যান। রাতে যখন আসবেন তখন নিয়ে আসবেন।'

'আপনি কাজটা ঠিক করছেন না।'

'সবাই তো আর ঠিকঠাক কাজ করে না। কেউ-কেউ ভুলভাল কাজ করে। আমি ভুলভাল কাজ করতেই অভ্যস্ত। আপনি চিঠি নিয়ে চলে যান।'

'জ্বি-না, আমি অপেক্ষা করব।'

'বেশ, অপেক্ষা করুন। আমার ঘরে একটা চেয়ার আছে। বের করে নিয়ে যান। বারান্দায় বসুন। শুভ বিকাল।'

আমি চেয়ার বের করে দিলাম। দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল সারলাম। ম্যানেজার বসে আছে মূর্তির মতো। আমি দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে গেলাম। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। দরজা না খুলেই ডাকলাম, ম্যানেজার সাহেব।

'জ্বি?'

'আপনি এখনো আছেন?'

'জ্বি।'

'সঙ্গে গাড়ি আছে?'

'আছে।'

'তাহলে তরঙ্গিণী স্টোরে চলে যান। একটা বল পয়েন্ট কিনে আনবেন। চিঠির

জবাব লিখতে হবে। আমার কাছে একটা বল পয়েন্ট আছে। দশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম — লেখা দিচ্ছে না।'

'আমার কাছে কলম আছে।'

'আপনার কলমে কাজ হবে না। আমাকে লিখতে হবে নিজের কলমে।'

'তরঙ্গিণী স্টোর থেকেই কিনতে হবে?'

'জ্বি।'

'স্টোরটা কোথায়?'

'বলছি। আপনার কাছে বল পয়েন্টের দাম হয়ত তিন টাকা চাইবে কিন্তু আপনি দেবেন দশ টাকা। নিতে না চাইলে জোর করে দেবেন।'

ম্যানেজার নিঃশ্বাস ফেলে বলল, জ্বি আচ্ছা, দেব। আপনি দয়া করে চিঠিটা পড়ুন। তার কঠিন ভাব এখন আর নেই। এখন সে ভীত চোখেই আমাকে দেখছে।

আমি দরজা খুলে চিঠি নিলাম। ম্যানেজার সাহেবকে তরঙ্গিণী স্টোরটা কোথায় বুঝিয়ে বললাম। ভদ্রলোক আর একবার বলল, অন্য কোনো জায়গা থেকে কিনে আনলে হবে না?

আমি কঠিন গলায় বললাম, না।

নীতু লিখেছে —

হিমু সাহেব,

আশা করি সুখে আছেন। অবশ্যি আমার আশা করা না করায় কিছু যায় আসে না। আপনি সব সময় সুখেই থাকবেন, এবং আপনার আশেপাশের মানুষদের নানানভাবে বিভ্রান্ত করবেন, বিপদে ফেলবেন। অন্যদের সমস্যায় ফেলাতেও সুখ আছে। সেই সুখের ঘাটতি আপনার কখনো হয় না।

আপনি নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে জেনেছেন যে আপনার বন্ধু অবশেষে আপনার সুচিন্তিত পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। তিনি ভিখিরি হয়েছেন। ভিখিরির মতো সাজসজ্জা করে পথে-পথে ঘুরছেন। এমন হাস্যকর ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা কোনোদিনও কল্পনা করিনি। ইয়াদ বুদ্ধিমান নয় এই তথ্য আপনি যেমন জানেন, আমিও জানি। কিন্তু ও যে কতটা বোকা তা আপনিই চোখে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখালেন।

ইয়াদের আত্মীয়স্বজনদের আমি বলেছি ব্যাপারটা আর কিছুই না,

ইয়াদের একধরনের খেলা। ওরা ব্যাপারটা সেভাবেই নিয়েছে, এবং বেশ মজাও পাচ্ছে। কিন্তু আমি তো জানি ব্যাপারটা খেলা হলেও আপনার জন্যে খেলা, ইঁয়াদের জন্যে নয়। আপনি যে খেলা খেলছেন তা হল **dangerous game.** আশা করি আপনি জানেন খেলা কোথায় শেষ করতে হয়।

আমি দু' জন লোক ইয়াদের পেছনে লাগিয়ে রেখেছি। ওরা সব সময় তার দিকে লক্ষ রাখছে। আমার ধারণা ছিল, দু' দিন পার হবার আগেই ওর মোহভঙ্গ হবে এবং সে বাড়িতে ফিরে আসবে। আমাকে জোর খাটিয়ে কিছু করতে হবে না। কিন্তু সে বাসায় ফিরছে না। আপনি এই চিঠি পাওয়ামাত্র এমন ব্যবস্থা করবেন যেন সে বাড়িতে ফিরে আসে। আমি একটি ব্যাপার খুব পরিষ্কার করে আপনাকে জানাতে চাই, তা হল — ও বোকা হোক, যাই হোক, ওকে আমি অসম্ভব ভালবাসি।

ভালবাসা মাপার যন্ত্র বের হয়নি। বের হলে আমার ভালবাসার পরিমাণ আপনাকে মেপে দেখাতাম। ওর কোনোরকম ক্ষতি আমি সহ্য করব না। কাউকে সেই ক্ষতি করতেও দেব না। ও কোথায় রাত্রি যাপন করে তা আমাদের ম্যানেজার সাহেব জানেন। উনিই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবেন।

ওর মাথা থেকে ভূত সরিয়ে আপনি ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন এবং আর কোনোদিনও ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন না। আপনার জন্যে এই কাজ কঠিন নয়, বেশ সহজ। এই সহজ কাজের জন্যে আমি অনেক বড় মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি। **Tell me your price.**

আরো কিছু কথা বলার ছিল, ক্লান্ত বোধ করছি।

নীতু

আমি চিঠি শেষ করে ডাকলাম, ম্যানেজার সাহেব!

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, জ্বি স্যার।

'আপনাকে কি চিঠির জবাব নিয়ে যেতে বলেছে?'

'জ্বি।'

'বল পয়েন্ট এনেছেন?'

'জ্বি।'

'কত নিয়েছে?

'চার টাকা চেয়েছিল — আপনি দশ টাকা দিতে বলেছেন, দিয়েছি। নিতে চাচ্ছিল না। আপনার কথা বলে জোর করে দিয়ে এসেছি।'

'ভাল করেছেন।'

'আপনি কি চিঠির জবাব দেবেন?'

'না। তবে আপনাকে নিয়ে ইয়াদের খোঁজে যাব। চলুন যাওয়া যাক।'

'এখন গেলে উনাকে পাওয়া যাবে না। উনার একটা ঘুমাবার জায়গা আছে — রাত এগারোটার দিকে সেখানে ফেরেন।'

'তাকে কি এখন ভিখিরির মতো লাগে?'

'জ্বি, লাগে।'

'ভিক্ষা শুরু করেছে?'

'জ্বি-না।'

'চলছে কীভাবে?'

'তা ঠিক জানি না। কিছু টাকাপয়সা নিয়ে বের হয়েছিলেন বলে মনে হয়।'

'খাওয়াদাওয়া করছে?'

'প্রথম দিন কিছু খাননি। রাতে একটা পাউরুটি খেয়েছেন।'

'তারপর?'

'আমি শুধু প্রথম দিনের খবরই জানি।'

'ওর দিকে লক্ষ রাখার জন্যে লোক রাখা আছে না?'

'জ্বি-আছে।'

'ম্যানেজার সাহেব, আপনি নিজে কি খাওয়া-দাওয়া করেছেন, না দুপুর থেকে এখানেই বসে আছেন?'

'খাইনি কিছু।'

'যান, খেয়ে আসুন।'

'জ্বি-না।'

'না কেন?'

ম্যানেজার জবাব দিল না। আমি বললাম, নীতু কি বলে দিয়েছে আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল না করতে?

'জ্বি।'

'তা হলে চলুন। আমার সঙ্গেই চলুন। আপনাকে খাইয়ে আনি।'

'লাগবে না।'

'আসুন যাই।'

'স্যার, আমি কিছু খাব না।'

১০

রাত এগারোটায় ইয়াদের সন্ধানে বের হলাম।

ইয়াদ থাকে মীরপুর দশ নম্বরে, সিঅ্যান্ডবি গুদামে। গুদামের ভেতর গাদাগাদি করে রাখা রাস্তার কালভার্টের সিরামিক স্ল্যাব। দেখতে বিশাল আকৃতির সিলিন্ডারের মতো। তার একটিতে ইয়াদের সংসার। বাইরে থেকে ইয়াদ বলে ডাকতেই সে খুশি-খুশি গলায় বলল, চলে আয়। মাথা নিচু করে ঢুকবি। দাঁড়া এক সেকেণ্ড, বাতি জ্বালাই। সে কুপি জ্বালল। আমি ঢুকলাম। ভক করে খানিকটা পচা দুর্গন্ধ নাকে ঢুকল।

'গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসছে রে ইয়াদ!'

'প্রথম খানিকক্ষণ গন্ধ পাবি। তারপর পাবি না। মাথা নিচু করে ঢোক্।'

সিলিন্ডার স্লাবের এক মাথা পলিথিন দিয়ে মোড়ানো, অন্য মাথায় চটের পর্দা। নিচে পুরানো একটা কম্বল লম্বালম্বি বিছানো। কম্বলের উপর ইয়াদ হাসিমুখে বসে আছে।

'তুই আসবি জানতাম। ইচ্ছা করেই তোকে খবর দিইনি। তুই হচ্ছিস গ্রে হাউন্ড টাইপ। গন্ধ শুঁকে-শুঁকে চলে আসবি। আমার সংসার কেমন দেখছিস?'

'মন্দ না।'

'মন্দ না মানে? একসেলেন্ট। শীত টের পাচ্ছিস?'

'না।'

'পুব-পশ্চিমে মুখ করা। উত্তরী বাতাস ভেতরে ঢোকার কোনো উপায় নেই। মশা লাগছে?'

'না।'

'এক মুখ পলিথিন দিয়ে ঢাকা, অন্য মুখে চটের পর্দা। মশা ঢোকার কোনো উপায় নেই।'

'এরকম আরামের জায়গার খোঁজ পেলি কোথায়?'

'এরচেয়েও আরামের জায়গা আছে। ভাড়া বেশি।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ভাড়া দিতে হয়!

'অবশ্যই দিতে হয়।'

'এর ভাড়া কত?'

'দু' টাকা।'

'মাসে দু' টাকা?'

ইয়াদ বিরক্ত হয়ে বলল, তুই কি পাগলটাগল হয়ে গেলি? শায়েস্তা খাঁর আমল ভেবেছিস? পার নাইট দু' টাকা। শীতকালে চার্জ বেশি। গরমক্যালে পার নাইট এক টাকা। মাসচুক্তির কোনো ব্যাপার নেই।

'ভাড়া নেয় কে?'

'সর্দার আছে। সর্দার নেয়। সিঅ্যান্ডবি-র দারোয়ান নেয়, পুলিশ নেয়, অনেক ভাগাভাগি। পুরোপুরি জানি না।'

'দু' টাকা ভাড়া দিয়ে কেউ থাকে?'

'অবশ্যই থাকে। কোনোটা খালি নেই। তা ছাড়া অনেক স্পেস। কোনো-কোনোটায় পুরো ফ্যামিলি আঁটে। চা খাবি?'

'তোর এখানে কি চা বানাবার ব্যবস্থা আছে?'

'আরে না! তবে কাছেপিঠেই আছে। ডাক দিলে দিয়ে যাবে। চা, সিগারেট, পান।'

'সুখে আছিস মনে হয়।'

'অবশ্যই সুখে আছি। কোনোরকম চিন্তা-ভাবনা নেই। কে কি বলল তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই — কী আরামের ঘুম যে হয়, তুই বিশ্বাস করতে পারবি না। আমার কি মনে হয় জানিস? আরামের ঘুম কী জিনিস এটা জানার জন্যেই আমাদের সবার কিছুদিনের জন্যে হলেও ভিখিরি হওয়া উচিত। তার উপর ভিখিরিদের মধ্যে কমিউনিটি ফিলিং যা আছে তারও তুলনা নেই। বাইরে থেকে আমাদের মনে হয় এক ভিখিরি অন্য ভিখিরিকে দেখতে পারে না, এটা খুবই ভুল কথা। সবাই সবার খোঁজ রাখে। ধর, সিগারেট খা।'

'সিগারেট ধরেছিস?'

'হুঁ, ধরেছি। হাইকোর্ট মাজারের কাছে এক রাতে গাঁজা খেয়েছি। দু' টান দিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। উঠলাম সকালে — হা হা হা।'

ইয়াদ গা দুলিয়ে হাসতে লাগল। আমি বললাম, নীতুর কথা মনে হয় না?

ইয়াদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, না।

'একেবারেই না?'

'উঁহু। তুই বলায় মনে পড়ল।'

'ও কেমন আছে জানতে চাস না?'

'ভাল আছে তো বটেই। খারাপ থাকবে কেন?'

'তোর আসল কাজ কেমন এগুচ্ছে?'

'এগুচ্ছে না। অবশ্যি আমি নিজেই গা করছি না। তাড়া তো কিছু নেই। হোক ধীরেসুস্থে। আগে ওদের মেইন স্ট্রীমের সঙ্গে মিশে নিই — তারপর।'

'ওদের মেইন স্ট্রীমের সঙ্গে এখনো মিশতে পারিসনি?'

'উঁহু। ওরা খুব চালাক, বুঝলি হিমু, চট করে ধরে ফেলে যে আমি ওদের একজন না। বাইরের কেউ।'

'কিছু বলে না?'

'না, কিচ্ছু বলে না। চুপ করে থাকে। তবে আমার মতো অনেকেই আছে।'

'বলিস কী!'

'নানান ধান্ধায় ভিখিরি সেজে ঘোরে। বিদেশী আছে বেশ কয়েকটা। এর মধ্যে একটা আছে নেদারল্যান্ডের, বিরাট চোর। চা খাবি কিনা তা তো বললি না। খাবি?'

'খাব।'

ইয়াদ চটের পর্দা সরিয়ে ডাকল, তুলসী, তুলসী, দু'টা চা।

'তুলসীকে দেখে রাখ্ — অসাধারণ একটা মেয়ে। আমি আমার জীবনে এত ভাল মেয়ে দেখিনি — কী যে বুদ্ধি! তোর তো অনেক বুদ্ধি, তোকেও সে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচে ফেললে তুই টেরও পাবি না।'

'তুলসীর বয়স কত?'

'সাত-আট হবে। বেশি না।'

'ও কি ভিক্ষা করে?'

'গাবতলি বাসস্ট্যান্ডে চা বিক্রি করে। তুলসীর বাবা আর সে, দু'জনের ব্যবসা। ভাল রোজগার।'

তুলসী চা নিয়ে ঢুকল। মেয়েটার গায়ে সুন্দর গরম স্যুয়েটার। মাথার চুল লাল। স্বর্ণকেশী বালিকা। ইয়াদ বলল, তুলসী হল আমার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড।

তুলসী আড়চোখে আমাকে দেখল, কিছু বলল না। ইয়াদ বলল, চায়ের কাপ থাক্, পরে নিয়ে যাবি। হিমু, তুলসীকে কেমন দেখলি?

'ভাল।'

'মারাত্মক বুদ্ধি! কি করে বুঝলাম জানিস? তুলসী আমাকে বলল, দু'জন লোক আমার উপর নজর রাখছে। আমি কিচ্ছু বুঝিনি।'

'দু'জন তাহলে তোর উপর নজর রাখছে?'

'হুঁ। নীতুর কাণ্ড। আমাকে সারাক্ষণ চোখে-চোখে রাখা হল ওর অভ্যাস। কোনদিন দেখব টুটি-ফুটিকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।'

'উপস্থিত হলে কি করবি?'

ইয়াদ গম্ভীর গলায় বলল, সত্যি সত্যি উপস্থিত যদি হয়, তাহলে বলব, আমার সঙ্গে থেকে যাও নীতু।

'কি মনে হয় তোর, নীতু থাকবে?'

'কিছু বলা যায় না, থাকতেও পারে। এখানে থাকাটা কিন্তু আরামদায়ক। এক রাত থেকে যা, তুই নিজেই টের পাবি। থাকবি?'

'উহু, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'কুপির ধোঁয়ায় দম বন্ধ হচ্ছে। কুপি নিভিয়ে দিলেই দেখবি — আরাম।'

ইয়াদ ফুঁ দিয়ে কুপি নিভিয়ে দিল চারদিকে ঘন অন্ধকার। এমন অন্ধকার আমি আমার জীবনে দেখিনি।

'হিমু!'

'হুঁ।'

'ভিখিরিদের সঙ্গে আমার একদিন-দু'দিন থাকলে হবে না। অনেক দিন থাকতে হবে। এখনো ঠিকমতো ডাটা কালেক্ট শুরু করিনি, তবু অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য পাচ্ছি। একটা তোকে বলি — আমাদের ধারণা, মাসের এক-দুই তারিখের দিকে ভিখিরিরা বেশি ভিক্ষা পায়। লোকজনের হাতে বেতনের টাকা থাকে। তারা ভিক্ষা বেশি দেয়। ব্যাপার মোটেই তা না। সবচে' বেশি ভিক্ষা পায় মাসের শেষ সপ্তাহে। ইন্টারেস্টিং না?'

'হুঁ। ইন্টারেস্টিং।'

'রিসার্চের অনেক কিছু আছে। যারা ভিক্ষা দিচ্ছে তাদের নিয়েও রিসার্চ হওয়া দরকার। এই দিকে কোনো কাজই হয়নি। ভিক্ষুকদের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে, এটা জানিস?'

'জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারি।'

'নাস্তিকতা যে ভিখিরিদের মধ্যে সবচে' বেশি এটা জানিস?'

'আঁচ করতে পারি।'

'ফ্যামিলি স্ট্রাকচার ওদের ভেঙে পড়েছে। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকে, আবার স্ত্রী অন্য কারো সঙ্গেও কিছুদিন থেকে স্বামীর কাছে ফিরে আসে। স্বামীর বেলাতেও

এটা সত্যি — এরা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সমাজ তৈরি করছে। সেই সমাজের আইনকানুন আলাদা। এরা যাযাবরদের মতো হয়ে যাচ্ছে। কোথাও একনাগাড়ে তিন রাতের বেশি থাকবে না। ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে। তোর কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে?

'লাগছে।'

'ভিখিরিদের রোজগার সম্পর্কে আগে যে সমীক্ষা করেছিলাম সেটা পুরোপুরি ভুল। ভিখিরিদের মধ্যে নতুন মা যারা, অর্থাৎ যাদের বাচ্চার বয়স এক মাস-দু' মাস, তারা খুব ভাল রোজগার করতে পারে। তবে এইসব ক্ষেত্রে নতুন মা'র শরীর দুর্বল বলে বের হতে পারে না — বাচ্চাটা ভাড়া খাটে। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা দৈনিক ভাড়া। এত সব তথ্য পাচ্ছি যে তুই কল্পনাও করতে পারবি না। এইসব তথ্য নিতে-নিতেই এক জীবন কেটে যাবে।'

'এর মানে কি এই যে — তুই তোর জীবন এই গর্তে কাটিয়ে দিবি? নীতুর কাছে ফিরে যাবি না?'

ইয়াদ হাই তুলতে তুলতে বলল, দেখি।

'আমি আজ যাচ্ছি।'

'কাল আসবি?'

'বুঝতে পারছি না — আসতেও পারি। তোর কিছু লাগবে? লাগলে বল, নিয়ে আসব।'

'কিছু লাগবে না।'

'টাকাপয়সা লাগবে?'

'না। পকেটে রুমাল থাকলে রেখে যা। সর্দি হয়ে গেছে। রুমালের অভাবে সামান্য অসুবিধা হচ্ছে।'

ইয়াদের কাছ থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় নেমে দেখি গাড়ি নিয়ে ম্যানেজার অপেক্ষা করছে। আমি বললাম, আপনি এখনো যাননি? চলে যান।

'আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই স্যার।'

'আমি হেঁটে বাড়ি ফিরব। পৌঁছে দিতে হবে না।'

'আপাকে কী বলব?'

'আমি কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। যা বলার আমি তখন বলব।'

'উনি খুব অস্থির হয়ে আছেন স্যার।'

'বুঝতে পারছি।'

'আগামী কাল সকালের দিকে আসতে পারেন না?'

'না।'

'কবে নাগাদ আসবেন? ঠিক দিনটা বললে আমার জন্যে ভাল হয়। আপা জিজ্ঞেস করবেন, কিছু বলতে না পারলে রাগ করবেন।'

'ম্যানেজার হয়ে জন্মেছেন — বসের রাগ তো সহ্য করতেই হবে। ভিখিরি হয়ে জন্মালে কারোর ধার ধারতে হত না। বেঁচে থাকছেন যাদের দয়ার উপর তাদের সমীহ করতে হচ্ছে না, ইন্টারেস্টিং না?'

ম্যানেজার জবাব দিল না। দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইল। বেচারার জন্যে আমার মায়া লাগছে — কিন্তু কিছু করার নেই। নীতুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় হয়নি। নীতুকে অপেক্ষা করতে হবে।

১১

রূপার চিঠি এসেছে। কী অবহেলায় খামটা মেঝেতে পড়ে আছে! আরেকটু হলে চিঠির উপর পা দিয়ে দাঁড়াতাম। খাম খুলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম — এতবড় কাগজে একটি মাত্র লাইন, তুমি কেমন আছ? নাম সই করেনি, তারিখ দেয়নি। চিঠি কোত্থেকে লেখা তাও জানার উপায় নেই। শুধু একটি বাক্য — তুমি কেমন আছ? প্রশ্নবোধক চিহ্নটি শাদা কাগজে কী কোমল ভঙ্গিতেই না আঁকা হয়েছে! আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হল রূপার আগের চিঠি পুরোটা পড়া হয়নি। কী লেখা ছিল সেই চিঠিতে? কোনোদিনও জানা যাবে না, কারণ চিঠি হারিয়ে ফেলেছি। নীতুকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যাবে। চিঠিটা নীতু পড়েছে। নীতুর কাছে যেতে হবে। যেতে ভরসা পাচ্ছি না, কারণ ইয়াদের খোঁজ পাচ্ছি না। সে তার আগের জায়গায় নেই। তুলসী মেয়েটি ছিল। সে কিছু জানে না কিংবা জানলেও কিছু বলছে না।

নীতুর ম্যানেজারও জানে না। নীতু যাদের ইয়াদের পেছনে লাগিয়ে রেখেছিল তাদের ফাঁকি দিয়ে ইয়াদ সটকে পড়েছে। যে-মানুষ ভোল পাল্টে ঢাকার ভিক্ষুকদের সঙ্গে মিশে গেছে তাকে খুঁজে বের করা খুব সহজ হবার কথা না। নীতু এবং তার আত্মীয়স্বজনরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বিত্তবানদের শক্তি তুচ্ছ করার বিষয় নয়। এরা একদিন ইয়াদকে খুঁজে বের করবে। নীতু যখন তার সামনে এসে দাঁড়াবে তখন ইয়াদকে মাথা নিচু করে তার সঙ্গেই যেতে হবে, কারণ নীতুর আছে ভালবাসার প্রচণ্ড শক্তি। এই শক্তি অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ঈশ্বর মানুষকে দেননি। এই ক্ষমতা তিনি শুধু তাঁর কাছেই রেখে দিয়েছেন।

ইয়াদ কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হল মোরশেদ। সেও উধাও হয়ে গেছে। মজনু মিয়ার ভাতের হোটেলে সে খেতে আসে না। পুরানো বাসায় যায় না। তাঁর আত্মীয়স্বজনদের ঠিকানা জানি না। তবে সে তার আত্মীয়স্বজনদের কাছে যাবে, তাও মনে হয় না।

সে একমাত্র এষার কাছেই যেতে পারে। কেন জানি মনে হচ্ছে তার কাছেও যায়নি। বড় শহরে হঠাৎ হঠাৎ কিছু লোকজন হারিয়ে যায় — কেউ তাদের কোনো খোঁজ দিতে পারে না। মোরশেদও কি হারিয়ে গেছে? অদৃশ্য হয়ে গেছে? প্রকৃতি

মানুষকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছে। অদৃশ্য হবার ক্ষমতা দেয়নি। তবে মানুষের সেই অক্ষমতা প্রকৃতি পুষিয়ে দেবার ব্যবস্থাও করেছে — কেউ অদৃশ্য হতে চাইলে প্রকৃতি সেই সুযোগ করে দেয়।

একদিন গেলাম এষাদের বাড়ি। এষা দরজা খুলে আনন্দিত গলায় বলল, আরে আপনি!

'কেমন আছেন?'

'ভাল আছি। ঐ যে আপনি গেলেন আর খোঁজ নেই। দাদীমা রোজ একবার জিজ্ঞেস করে লোকটা এসেছে?'

'উনি কি আছেন?'

'না, নেই। আমার কি ধারণা জানেন, আমার ধারণা আপনি খোঁজখবর নিয়ে আসেন। যখন দাদীমা থাকে না, তখনি উপস্থিত হন। আসুন, ভেতরে আসুন।'

আজ এষাকে অনেক হাসিখুশি লাগছে। মনে হচ্ছে তার বয়সও কমে গেছে। উজ্জ্বল রঙের শাড়ি পরেছে। তবে আজো খালি পা।

'ঐদিন আপনি দাদীমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। উনার অষুধপত্র লেগেছিল। আপনি কিনে দিলেন। দাদীমা ঐ টাকা আপনাকে দিতে চাচ্ছেন। সে জন্যেই তিনি আপনাকে এত খোঁজ করছেন। আমি দাদীমাকে বললাম, তুমি শুধু-শুধু ব্যস্ত হচ্ছ — টাকা দিলেও উনি নেবেন না।'

'টাকা নেব না এই ধারণা আপনার কেন হল?'

'আপনাকে দেখে, আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে। আমি মানুষকে দেখে অনেক কিছু বুঝতে পারি।'

'না, বুঝতে পারেন না। টাকা আমি নেব। সব মিলিয়ে একচল্লিশ টাকা খরচ হয়েছে। আজ আমি টাকাটা নিতেই এসেছি।'

'আপনি সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বসুন, টাকা নিয়ে আসছি।'

এষা টাকা নিয়ে এল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এষা বলল, আপনি বসুন। আমি আবার বসলাম। এষা বসল আমার সামনে। সহজ গলায় বলল, আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। আমি সামনের সপ্তাহে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছি। আমেরিকার নিউজার্সিতে আমার মেজো ভাই থাকেন। ইমিগ্রেন্ট। তিনি আমার জন্যে গ্রীন কার্ডের ব্যবস্থা করেছেন। আমি তাঁর কাছে চলে যাব।

'বাহ্, ভাল তো!'

'ভাল-মন্দ জানি না। ভাল-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামাইনি।'

'ভাল হবারই সম্ভাবনা। নতুন দেশে, সম্পূর্ণ নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবেন। এখানে থাকলে হঠাৎ-হঠাৎ পুরানো স্মৃতি আপনাকে কষ্ট দেবে। হয়তো হঠাৎ একদিন মোরশেদের সঙ্গে পথে দেখা হল। আপনি কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না, তিনিও ভেবে পাচ্ছেন না। কিংবা ধরুন খিলগাঁয় আপনাদের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ মনে হল, আরে, এই বাড়ির বারান্দায় চেয়ার পেতে জোছনা রাতে দু'জন বসে কত গল্প করেছি . . .'

এষা আমাকে থামিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এসব আমাকে কেন বলছেন?

'এম্নি বলছি।'

'শুনুন হিমু সাহেব! আপনি খুব সূক্ষ্মভাবে আমার মধ্যে একধরনের অপরাধবোধ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন।'

'চেষ্টা করতে হবে কেন? আপনার ভেতর এম্নিতেই কিছু অপরাধবোধ আছে। দেশ ছেড়ে চলে যাবার পেছনেও এই অপরাধবোধ কাজ করছে।'

'সেটা নিশ্চয়ই দূষণীয় নয়।'

'দূষণীয়। মানুষকে পুরোপুরি ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে এমন ক'টি জিনিসের একটি হল অপরাধবোধ। আপনি এই অপরাধবোধ ঝেড়ে ফেলুন।'

'কীভাবে ঝেড়ে ফেলব?'

'দেশ ছেড়ে যাবার আগে মোরশেদ সাহেবের সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক তৈরি করুন। কথা বলুন, গল্প করুন। তার একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়া যায় কিনা দেখুন। চাকরি খোঁজার ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্যও করতে পারি। কিছু ক্ষমতাবান মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।'

'হিমু সাহেব! আপনি নিতান্তই আজেবাজে কথা বলছেন। আমি এর কোনোটিই করব না। এগারো তারিখ বেলা তিনটায় আমার ফ্লাইট। আমি অসম্ভব ব্যস্ত। তা ছাড়া ইচ্ছাও নেই।'

'টিকিট কাটা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মেজো ভাই টিকিট পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট।'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, এষা, আপনি কিন্তু যেতে পারবেন না। আপনাকে থাকতে হবে এই দেশেই।

'তার মানে!'

'মানে আমি জানি না। আমি মাঝে-মাঝে চোখের সামনে ভবিষ্যৎ দেখতে পাই। আমি স্পষ্ট দেখছি আপনি মোরশেদ সাহেবের হাত ধরে বিরাট একটা আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন।'

'আপনি কি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন?'

'ভয় দেখাচ্ছি না। কি ঘটবে তা আগেভাগে বলে দিচ্ছি।'

'প্লীজ, আপনি এখন যান। আপনার সঙ্গে আমার কথা বলাই ভুল হয়েছে। শুনুন হিমু সাহেব, এগারো তারিখ বেলা তিনটায় আমার ফ্লাইট — আপনার কোনো ক্ষমতা নেই আমাকে আটকানোর। প্লীজ এখন যান। আর কখনো এখানে এসে আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

আমাকে দু'টা টেলিফোন করতে হবে। রিকশা নিয়ে তরঙ্গিণী স্টোরে উপস্থিত হলাম। নতুন ছেলেটা কঠিন চোখে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, বল পয়েন্ট কিনতে এসেছি। এই নিন দশ টাকা। ছেলেটার কঠিন চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। সে আমাকে বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারছে না বলেই ভয় পাচ্ছে।

'কয়েকদিন আগে এক ম্যানেজার সাহেবকে কলম কিনতে পাঠিয়েছিলাম। এসেছিল?'

ছেলেটা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার চোখে ভয় আরো গাঢ় হচ্ছে।

'সেই কলমেও লেখা হচ্ছে না বলেই আরেকটা কেনার জন্যে আসা।'

'ভাইজান, আপনার পরিচয় কি?'

'আমার কোনো পরিচয় নেই। আমি কেউ না। আমি হলাম নোবডি। টেলিফোন ঠিক আছে?'

'জ্বি আছে।'

'দু'টা টেলিফোন করব।'

প্রথম টেলিফোন বাদলকে। বাদল চমকে উঠে চিৎকার করল — কে, হিমুদা না?

'হুঁ।'

'কোত্থেকে টেলিফোন করছ?'

'কোত্থেকে আবার? জেলখানা থেকে।'

'জেলখানা থেকে টেলিফোন করতে দেয়?'

'দেয় না, তবে আমাকে দিয়েছে। জেলার সাহেব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

'তা তো দেবেনই। তুমি চাইলে কে "না" বলবে! তোমার কতদিনের জেল হয়েছে?'

'ছ' মাস।'

'সে কী! বাবা যে বলল, এক বছর।'

'এক বছরেরই হয়েছিল। ভাল ব্যবহারের জন্যে মাফ পেয়েছি।'

'তা হলে তোমার সঙ্গে আর মাত্র তিন মাস পর দেখা হবে।'

'হ্যাঁ।'

'আমার দারুণ লাগছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

'তুই আমার একটা কাজ করে দে বাদল। একজন লোককে খুঁজে বের করে দে। তাঁর নাম মোরশেদ।'

'কোথায় খুঁজব?'

'কোথায় যে সে আছে বলা মুশকিল। তবে আমার মনে হয় ১৩২ নম্বর খিলগাঁয় একতলা একটা বাড়ির সামনে সে গভীর রাতে একবার-না-একবার আসে। ঐ বাড়ির সামনে ফাঁকা জায়গাটায় সে একটা আমগাছ দেখতে পায়। আসলে কোনো গাছ নেই, কিন্তু লোকটা দেখে। গাছটা দেখার জন্যেই সে প্রতিরাতে একবার সেখানে যাবে। আমার তাই ধারণা।'

'বল কী!'

'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। জেল থেকে বের হয়ে তোকে সব গুছিয়ে বলব। এখন তোর কাজ হচ্ছে ঐ লোকটাকে বের করা। এবং তাঁকে বলা সে যেন অবশ্যি ১১ তারিখ বেলা তিনটার আগেই এয়ারপোর্টে বসে থাকে।'

'কেন হিমুদা?'

'একজন মহিলা ঐ সময় দেশ ছেড়ে যাবেন। লোকটার সঙ্গে মহিলার দেখা হওয়া উচিত। বলতে পারবি না?'

'অবশ্যই পারব। শুধু যে পারব তা না — আমি নিজেও এয়ারপোর্ট যাব।'

'তোকে যেতে হবে না। তুই শুধু খবরটা দে।'

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। মোরশেদ সাহেবকে আমি নিজেও খুঁজে বের করতে পারতাম, কিন্তু আমার অন্য কাজ আছে। আমাকে যেতে হবে ইয়াদের সন্ধানে। নীতুর সঙ্গেও দেখা করতে হবে।

১২

ইয়াদের বাড়ি সব সময় আলোয় আলোয় ঝলমল করে। সন্ধ্যার পর থেকেই এরা বোধহয় সব ক'টা বাতি জ্বালিয়ে রাখে। আজ ওদের বাড়ি অন্ধকার। গেট থেকে গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশের বাতিগুলো পর্যন্ত নেভানো। শুধু বারান্দার বাতি জ্বলছে। আমি গেটের দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ নেই নাকি?

'আপা আছেন।'

'কুকুর দু'টা কোথায় — টুটি-ফুটি?'

'ওরা বান্ধা আছে। ভয় নাই, যান।'

ভয় নেই বললেই ভয় বেশি লাগে। আমি ভয়ে-ভয়ে এগুচ্ছি। বারান্দায় বেতের চেয়ারে নীতুকে বসে থাকতে দেখলাম। আজ তার গায়ে শাদা রঙের শাড়ি। শাদা শাড়িতে নীল ফুলের সুতার কাজ। গায়ের চাদরটাও শাদা। শাদা রঙ মেয়েদের এত মানায় আজ প্রথম জানলাম। নীতু আমাকে দেখে উঠে এল। সহজ গলায় বলল, আসুন।

'ভাল আছেন?'

'হ্যাঁ, ভাল। এখানে বসবেন, না ভেতরে যাবেন?'

'বারান্দাই ভাল।'

'হ্যাঁ, বারান্দাই ভাল। আপনি কি লক্ষ করেছেন বেশির ভাগ সময় আমি বারান্দায় বসে থাকি?'

'আমি লক্ষ করেছি।'

'আপনার তাড়া নেই তো? আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি চা দিতে বলি। টুটি-ফুটিকে খাবার দিয়ে আসি। আমি খাবার না দিলে ওরা কিছু খায় না।'

নীতু উঠে গেল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ভেবেছিলাম নীতুকে খুব আপসেট দেখব। সে রকম মনে হচ্ছে না। আপসেট যদি হয়েও থাকে নিজেকে সামলে নিয়েছে। আমি লক্ষ করেছি ছোটখাট ব্যাপারে যারা অস্থির হয়, বড় ব্যাপারগুলিতে তারা মোটামুটি ঠিক থাকে।

ঘরে তৈরি সমুচা এবং পটভর্তি চা। ট্রে নীতু নিয়ে এসেছে। এই কাজ সে কখনো করে না। খাবার আনার অন্য লোক আছে।

'সমুচাগুলি এইমাত্র ভাজা হয়েছে, খান। ভাল লাগবে। সঙ্গে টক দেব?'

'না। টুটি-ফুটিকে খাবার দেয়া হয়েছে?'

'দেয়া হয়েছে।'

'ওরাও কি সমুচা খাচ্ছে?'

'না, ওরা সেদ্ধ মাংস খাচ্ছে। হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করা মাংস। দিনে ওরা একবারই খায়।'

আমি সমুচা খেতে-খেতে বললাম, বিলেতি কুকুর একবার খায়, কিন্তু দেশীগুলি সারাক্ষণ খায় — কিছু পেলেই খেয়ে ফেলে।

'ট্রেনিং দেয়া হয় না বলে সারাদিন খায়। ট্রেনিং দিলে ওরাও একবেলা খেত। চা ঢেলে দেব?'

'দিন।'

নীতু চা ঢেলে কাপ এগিয়ে দিল। আমি লক্ষ করলাম, শাদা শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নীতু কানে মুক্তার দুল পরেছে।

'মিষ্টি হয়েছে?

'হয়েছে।'

নীতু চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। বড় করে নিঃশ্বাস নিল। মনে হচ্ছে সে এখন কঠিন কিছু কথা বলবে।

'আপনি গিয়েছিলেন ইয়াদের কাছে?'

'জ্বি।'

'তাকে বলেছিলেন পাগলামি বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসতে?'

'না।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। আপনি তাকে দেখে খুব মজা পেয়েছেন। একজনকে শুধু কথায় ভুলিয়ে ভিখিরিদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেয়া তো সহজ কাজ না। কঠিন কাজ। সবাই পারে না। আপনি পারেন।'

আমি হাই তুলতে-তুলতে বললাম, আমি ওকে কিছু বলিনি, কারণ বলার প্রয়োজন দেখিনি।

কেন প্রয়োজন দেখেননি?'

ও ফিরে আসবে। ওর প্রতি আপনার ভালবাসা প্রবল, সেই ভালবাসা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ওর নেই।'

'বড়-বড় কথা বলে আমাকে ভোলাতে চাচ্ছেন?'

'না । যা সত্যি তাই বললাম।'

'যা সত্যি তা আপনি কাউকে বলেন না, কারণ সত্যটা কি তা আপনি নিজেও জানেন না। আপনি বিভ্রম তৈরি করতে পারেন বলেই বিভ্রমের কথা বলেন। আমি খুব বিনীতভাবে আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। আশা করেছিলাম আপনি আসবেন। আসেননি। ইয়াদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন — তাও আমার কারণে যাননি। ইয়াদকে আপনি কানে মন্ত্র দিয়েছেন — তাকে বলেছেন যে দু'জন লোক তার পেছনে লাগানো আছে। যে জন্যে সে ভোররাতে সবার চোখে ধুলা দিয়ে পালিয়ে যায়। আমি কি ঠিক বলছি না? চুপ করে থাকবেন না। উত্তর দিন।'

আমি বললাম, একটা সিগারেট কি খেতে পারি?

নীতু নরম গলায় বলল, অবশ্যই খেতে পারেন। আপনার বন্ধু গাঁজা খেয়ে মাঠে পড়ে ছিল, আপনি সিগারেট খাবেন না কেন? তবে ভাববেন না আপনাকে আমি সহজে ছেড়ে দেব। আপনাকে আমি কঠিন শাস্তি দেব।

'কি শাস্তি?'

'আপনি তো ভবিষ্যৎ বলে বেড়ান। কাজেই আপনি নিজেই অনুমান করুন। দেখি আপনার অনুমান ঠিক হয় কি না।'

'অনুমান করতে পারছি না।'

'চা খাবেন আরেক কাপ? পটে চা আছে।'

'না, আর খাব না। আমি এখন উঠব। আর আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। ইয়াদ চলে আসবে।'

'সান্ত্বনার জন্যে ধন্যবাদ।'

নীতু হাসল। কিন্তু তার চোখ অসুস্থ মানুষের চোখের মতো ঝকঝক করছে। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। নীতু বলল, আপনাকে কি শাস্তি দেব তা না বলেই চলে যাচ্ছেন যে! অনুমান করতে পারছেন না?

'না।'

'একটু চেষ্টা করুন। চেষ্টা করলেই পারবেন।'

'পারছি না।'

'আচ্ছা যান।'

নীতু উঠে দাঁড়াল। আমি গেটের দিকে এগুচ্ছি — এবং ভয় পাচ্ছি। অকারণ তীব্র ভয়। মনে হচ্ছে শরীর ভারী হয়ে এসেছে। ঠিকমতো পা ফেলতে পারছি না। গেটের প্রায় কাছাকাছি চলে যাবার পর বুঝতে পারলাম নীতু কী শাস্তি দিতে যাচ্ছে। একবার ইচ্ছা করল চেঁচিয়ে বলি — 'না নীতু, না।'

তার সময় পাওয়া গেল না — টুটি-ফুটি উল্কার মতো ছুটে এল। মাটিতে পড়ে যাবার আগে এক ঝলক দেখলাম বারান্দায় আঙুল উঁচিয়ে নীতু দাঁড়িয়ে আছে। ধবধবে শাদা পোশাকে তাকে দেখাচ্ছে দেবী প্রতিমার মতো। নীতু হিসহিস করে বলল, Kill him. Kill him.

১৩

আমি বাস করছি অন্ধকারে এবং আলোয়। চেতন এবং অবচেতন জগতের মাঝামাঝি। Twilight zone. আমার চারপাশের জগৎ অস্পষ্ট। আমি কি বেঁচে আছি? আমাকে ঘিরে অনেক লোকের ভিড়। এটা কি কোনো হাসপাতাল? আমার কোনো ক্ষুধাবোধ নেই, কিন্তু প্রবল তৃষ্ণা। পানি পানি বলে চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে। চিৎকার করতে পারছি না। স্বপ্ন ও সত্য একাকার হয়ে গেছে। বাস্তব এবং কল্পনা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে এগুচ্ছে। আমি এদের আলাদা করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না।

মোটা গম্ভীর স্বরে একজন কেউ বলছেন,

'হিমু সাহেব! হিমু সাহেব। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? জবাব দেবার দরকার নেই — জবাব দেবার চেষ্টা করবেন না। শুধু একটু আঙুল নাড়ানোর চেষ্টা করুন। আমি আপনার ডাক্তার। আপনি যদি আমার কথা শুনতে পান তাহলে পায়ের আঙুল নাড়ানোর চেষ্টা করুন।'

আমি প্রাণপণে পায়ের আঙ্গুল নাড়াতে চেষ্টা করি। পারি কি পারি না বুঝতে পারি না। মোটা গলার ডাক্তার সাহেবের কথাও শুনতে পাই না। আশেপাশে সব শব্দ অস্পষ্ট হয়ে আসে — তখন গভীর কোনো নৈঃশব্দ থেকে আমার বাবার গলা শুনতে পাই —

'খোকা! খোকা! আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস? শুনতে পেলে আঙুল-ফাঙুল নাড়াতে হবে না। মনে-মনে বল শুনতে পাচ্ছি। তা হলেই আমি বুঝব। শুনতে পাচ্ছিস খোকা?'

'পাচ্ছি। তুমি আমাকে খোকা ডাকছ কেন? তুমিই তো নাম দিলে হিমালয়।'

'তোর মা খোকা ডাকত — এই জন্যে ডাকছি। শোন্ খোকা, তোর অবস্থা তো কাহিল — টুটি-ফুটি তোর পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে ফেলেছে। আমি অবশ্যি খুব খুশি।'

'তুমি খুশি?'

'খুব খুশি। মহাপুরুষ হবার একটি ট্রেনিং বাকি ছিল — তীব্র শারীরিক যন্ত্রণার ট্রেনিং। সেটি হচ্ছে।'

'আমি কি মারা যাচ্ছি?'

'বলা মুশকিল। ফিফটি-ফিফটি চান্স। এটাও ভাল হল — ফিফটি-ফিফটি চান্সে দীর্ঘদিন থাকার দরকার আছে। এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা!'

'বাবা, তুমি কি সত্যি আমার সঙ্গে কথা বলছ, না এসব আমার মনের কল্পনা?'

এটাও বলা মুশকিল, ফিফটি-ফিফটি চান্স। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা, পুরোটি তোর অসুস্থ থাকার কল্পনা। আবার পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা আমি কথা বলছি তোর সঙ্গে। বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না, খোকা। ওরা তোকে মর্ফিয়া দিচ্ছে। তুই এখন ঘুমিয়ে পড়বি।'

'আজ কী বার বাবা? কত তারিখ?'

'জানি না। তোরও জানার দরকার নেই। আমি এবং তুই আমরা দু'জনই এখন বাস করছি সময়হীন জগতে। এই জগতটা অদ্ভুত খোকা। ভরি অদ্ভুত। এই জগতে সময় বলে কিছু নেই। আলো নেই, অন্ধকার নেই . . . কিছুই নেই . . . '

'আমার তারিখ জানার খুব দরকার। এগারো তারিখ এষা চলে যাবে। মোরশেদ সাহেবের এয়ারপোর্টে যাবার কথা। উনি কি গেছেন? এষা কি তাঁর সঙ্গে ফিরে এসেছে?'

'তুই কি চাস সে ফিরে আসুক?'

'চাই।'

'তা হলে ফিরে এসেছে। সময়হীন জগতের মজা হচ্ছে, এই জগতের বাসিন্দারা যা চায় — তাই হয়। সমস্যা হচ্ছে এই জগতের কেউ কিছু চায় না।'

'হিমু সাহেব! হিমু সাহেব! আমি আপনার ডাক্তার। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পেলে পায়ের আঙুল নাড়ান। গুড, ভেরি গুড। দেখি, এবার হাতের আঙুল নাড়ান। কষ্ট হলেও চেষ্টা করুন। আপনি পারবেন। আপনি অবশ্যই পারবেন। ভেঙে পড়লে চলবে না — আপনাকে মনে জোর রাখতে হবে। সাহস রাখতে হবে।'

একসময় আমার জ্ঞান ফেরে। ডাক্তার চোখের বাঁধন খুলে দেন। আমি অবাক হয়ে চারপাশের অসহ্য সুন্দর পৃথিবীকে দেখি। ফিনাইলের গন্ধভরা হাসপাতালের ঘরটাকে ইন্দ্রপুরীর মতো লাগে। মায়াময় একটি মুখ এগিয়ে আসে আমার দিকে

'ছোটমামা, আমাকে কি চিনতে পারছেন? আমি মোরশেদ। চিনতে পারছেন?'

'পারছি। এষা কোথায়?'

' ও বারান্দায় আছে। ভেতরে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। ওকে কি ডাকব?'

'না, ডাকার দরকার নেই।'

'আপনি কথা বলবেন না, ছোটমামা। আপনার কথা বলা নিষেধ।'

আমি কথা বলি না। চোখ বন্ধ করে ফেলি — আবারো তলিয়ে যাই গভীর ঘুমে। ঘুমের ভেতরই একটা বিশাল আমগাছ দেখতে পাই। সেই গাছের পাতায় ফোঁটা-ফোঁটা জোছনা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে। হাত ধরাধরি করে দু'জন হাঁটছে গাছের নিচে। মানব ও মানবী। কারা এরা? কি ওদের পরিচয়? দু'জনকেই খুব পরিচিত মনে হয়। কোথায় যেন দেখেছি — আবার মনে হয়, না তো, এদের তো কোনোদিন দেখিনি! অনেক দূর থেকে চাপা হাসির শব্দ ভেসে আসে। আমি চমকে উঠে বলি, কে আপনি? কে?

ভারী গম্ভীর গলায় উত্তর আসে। আমি কেউ না, **I am nobody** !

